ফুলে ফুলে খোঁজে ফেরে

কৃষণ চন্দর

ফুলে ফুলে খোঁজে ফেরে

কৃষণ চন্দর

(ইউনিকোড ব্যাসড্ টেক্সট পিডিএফ ভার্সন)

bengaliboi.com

ভূমিকা

বেশ আনন্দ চিত্তেই ভূমিকাটি লিখতে বসেছি ।কি জানি যারা পড়ছেন তারাও হয়তো বেশ আনন্দ চিত্তেই আছেন । যদি থেকে থাকেন তো আছেনই আর যদি মুখটা বেশ গোমড়া করে পড়তে বসে থাকেন তাহলেও ক্ষতি নেই ।আমি নিশ্চিত বইটা পড়তে পড়তে আপনার মুখটা আর গোমড়া থাকবেনা । বরং সেখানে থাকবে একটা ঝলমলে ভাব। একটা আশ্চর্যরকম তৃপ্তির স্বাদ ।

হ্যা, এটা এমনই একটি বই।পড়তে পড়তে একসময় আপনিই ডুবে যাবেন এই উপন্যাসের অস্তিরতিমতি নায়ক মোতিলাল নাগরে।আপনিই হয়ে উঠবেন নায়ক ।এ সভ্য জগতের ,এ বিজ্ঞানের যুগ ছেড়ে হয়তো আপনি চলে যাবেন শত শত মাইল দুরের সেই ভুতুরে কিল্লায় ।কিল্লার দুর্গম,নিরব,মিশমিশে অন্ধকারে হয়তো আপনিও কোন অজানাকে হাতরে ফিরবেন ।অন্ধকারে আলোর সন্ধানে ফুলে ফুলে খোঁজে ফিরবেন অজানা কাওকে । কে সে ?

সেকি আমাদের সবার মাঝেই বাস করে ?

না সে বাস করে জীবন থেকে কোটি কোটি বৎসর দুরে ?

সেকি বাস্তব, না কল্পনা ?

বড্ড কৌতুহল হচ্ছে, না ?

যান তাঁকে খোঁজে ফিরুন বইটির পাতায় পাতায় ।

-জাবেদ ভুঁইয়া

বইটির ইউনিকোড ব্যাসড টেক্সট ভার্সনে যাদের অবদান

১. সিফাত আল আসিফ
২. তরিদুর ইসলাম
৩. সাঈদ চৌধুরী শ্বাশত
৪. সাঈদ আল মুর্তজা
৫. প্রশান্ত ভৌমিক
৬. নিগার হালিমা নিশাত
৭. ইকবাল হাসান তন্ময়
৮. ইসমাইল চৌধুরী
৯. রোদেলা তুষার
১০. কাজী মৈত্রী
১১. M-Theoty Db
১২. লোহান শুভ্র
১৩. সাব্বির বিশ্বাস
১৪. সাদিয় আফরিন বৃষ্টি
১৫. শুভ্রত ঘোষ
১৬. জাহাঙ্গীর হোসাইন
১৭. মামুন মাহমুদ
১৮. তারিকুল ইসলাম
১৯. তাহমিদ আকিব
২০. রাসিফ আজাদ
২১. সাইকা সার্কিয়া
২২. Safayat Väinämöinen
২৩. মনিরুল ইসলাম সাঈদ
২৪. জুনায়েদ রিয়াদ
২৫. তৌফিক আহমেদ
২৬. মোঃ ইমদাদুল ইসলাম
২৭. লোহাগ পাল শুভ
৩০. আব্দুল্লাহ অভি

আমার নাম মোতিলাল নাগর । আমার বাবা রায়বাহাদুর প্যারেলাল নাগর ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন । এবং তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিলো তাঁর একমাত্র ছেলের দিকে- যাকে তিনি নিজের চেয়েও বড় জজ বানাতে চেয়েছিলেন । কিন্তু আমি লেখাপড়ায় ছিলাম একেবারে গোল্লায় । খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোন রকমে এন্ট্রান্স পাশ করলাম । কলেজেও এলাম । কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, পরপর দু'বার এফ. এ. ফেল করলাম । পরে তিন বছর বি. এ. তে । তারপর তো লেখাপড়াই ছেড়ে দিলাম । এবং ঘরে উঠে গেলাম । যে রকম বিধবারা শ্বশুর বাড়ীতে উঠে যায় ।

কিন্তু আমার বাবা হার মানতে রাজী নন । কখনো বা নায়েক তহশীলদার । কখনো পুলিশ , কেননা অনেক দিন থেকে শিকারের প্রতি শখ ছিলো আমার বেজায় । দেখতে শুনতেও আমি ছিলাম ফিটফাট, উচ্চতায় বেশ লম্বা চওড়া, নিরোগ শরীর, উজ্জল গায়ের রঙ এবং ডাগর ডাগর চোখ । কিন্তু মগজে ছিলো আমার একরাশ কিলবিল করা পোকা ।

আইনের মারপ্যাঁচ আর পুলিশওয়ালাদের ছলচাতুরী বুঝার মতো মাথার মগজ আমার ছিলো না । এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই বড় কৃতিত্বের সাথে ফেল মারতে শুরু করলাম । আসলে জজ-ব্যারিষ্টারী এবং তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ কাজ কারবারের মধ্যে কোন আকর্ষণ বোধ করতাম না আমি ।

রঙ আমি পছন্দ করি । আর পছন্দ করি রাতের নিঃশব্দ ভেদ করে চলা কোন বেগবতী ঝর্ণার অস্ফুট সঙ্গীত, আকাশের গোলাপী বিছানার রঙ পরিবর্তন । মনে হয় যেন বিভিন্ন রঙ ধীরে ধীরে বিভিন্ন ওড়না পরে কোথাও কোন এক মন্দিরের দিকে চলে যাচ্ছে । এবং যখন সবাই গভীর ঘুমের রাতে ডুবে যায়-তখন রাত যেন আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা নিঃশ্বাস নিতে থাকে । তখন আমি প্রায়শঃ ব্যাকুল হয়ে আমাদের ছোট শহরের অনেক পুরনো খানদানী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গভীর বনের দিকে চলে যাই । এবং একটি উঁচু টীলার উপর বসে বসে সে এক অদ্ভুত শব্দাবলী শুনি । এমন সব শব্দাবলী- যা আমার হৃদয়কে আঙ্গুলের স্পর্শের মতো হাতিয়ে ফেলে । আর আমার হৃদয় এক আশ্চর্য অর্গানের মতো বেজে ওঠে ।
এবং আমি, একজন সাধারন মানুষ এক বিরাট অজানা, অদেখা পৃথিবীর মতো প্রস্ফুটিত হতে হতে টীলা, জঙ্গল, রাত, মাতাল, অন্ধকার এবং নৈঃশব্দের ভেতর জড়িয়ে পড়ি । তখন নিজেকে চাঁদনীর মতো হালকা অনুভব করতে থাকি । আর দুঃখের মতো কালো, বিশ্বচরাচরের মতো অস্পষ্ট, ব্যথা-বেদনার মতো পরিপূর্ণ রহস্যময় এবং চাঁদনী মাখা নদীর মতো প্রবাহিত হই । আমি প্রবাহিত হই, প্রবাহিত হই নিয়ত তার সাথে ।

ময়ূর পাখা খুলে নাচে । আর আমি ময়ূরের সাথেই নাচি । চাঁদনীর সমতল ছাদে আমি কারো গোলাপী পদচরণ দেখতে পাই । এক জোড়া কোমল পাতলা পা-গজলের দু'টি পংক্তির মতো সামনে পেছনে চলতে চলতে কারো সাদা শাড়ীর কালো আঁচল চোখে পড়ে । এবং আমি জঙ্গলে এই চাঁদনী রাতে সেই এক জোড়া গোলাপী চরণকে দেখতে দেখতে হতভম্ব হয়ে যাই । রাত একটা লম্বা চাদরের মতো চাঁদনীর বিছানায় নিজের কালো পোষাক উড়িয়ে বসে থাকে । এবং আমার প্রতীক্ষায় থাকে । তখন এই বিশ্বচরাচরে শুধুমাত্র তিনটা বৃক্ষই বিরাজ করে । আমি, ময়ূর এবং রাত ।
জানি না আমার মগজে এমন আবর্জনা কে ভরে দিয়েছে । যেন সাদা সাদা একরাশ অস্পষ্টতায় ভরা আমার মগজ । এই পৃথিবীর কোনো বাস্তবতাই আমার কাছে ধরা দেয় না । সব সময় হৃদয় কেমন যেন দুঃখ ভারাক্রান্তই থেকে যায় । জানি না কেন ।

এবং আমার হাতজোড়া কারো চেহারা হাতড়াবার জন্যে খুঁজে ফেরে । আর এই পৃথিবী যতটা না স্পষ্ট হয়ে আসে তার চাইতেও বেশী রহস্যময় হয়ে দেখা দেয় । অথবা মনে হয় যেন এই পৃথিবীর পরও আরেকটি পৃথিবী আছে অথবা এই পৃথিবীর ভেতরেই আরেকটি পৃথিবী আছে । এই রঙের পরও কোন অজানা আরেক রঙ আছে । এই শব্দাবলীর পরও কিছু অশ্রুত শব্দাবলী আছে । পৃথিবীতে মাঠ-ঘাট আছে, বন-জঙ্গল আছে, ঘর-বাড়ী আছে, কৃষক আছে, দ্বন্দ আছে, বিচ্ছেদ আছে, আকর্ষণ আছে, ঘৃণা আছে, অন্ধকার আছে, সকাল আছে, কিন্তু জানি না আমার যে কি হলো । আমার কাছে এই দ্বন্দ জিনিসটা কেমন উপহাস বলে মনে হয় । বিচ্ছেদ অনুভূত হয় না, রাতকে আমার কাছে একটা দীর্ঘ ভ্রমণের মাঝে বাধা বলে মনে হয় । এবং পরে সকালে আমি ভাবি, আজ আমি সুবিস্তৃত দিগন্ত থেকে সূর্য ওঠার সময় কারো গোলাপী চরণ স্বচক্ষে অবলোকন করবো । এবং যখন দেখতে ব্যর্থ হলাম তখন হৃদয়টা আমার হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে । মন চায় দিগন্তটাকে আমার লম্বা নখ দিয়ে ছিড়ে ফেলি । এবং সেই চরণ যুগলকে দেখি-যেগুলো প্রভাতে ফিরবে সোনালী ঘুঙ্গুর পরে আমার কাছ থেকে দূরে কোথাও নাচতে চলে যাচ্ছে । কখনো কখনো আমি নিজের অনুভূতির কাঠিন্যে রূদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ি । মনে হয় যেন আমি উন্মাদ । অথবা অন্য কোন পৃথিবী থেকে এসেছি । এবং নিজের বাবা-মা'র সাথে আমার কোন আত্মীয়তা নেই । যেন আগন্তুকের মত কোথাও থেকে আমি এসেছি, এক অজানা প্রতিশোনের জন্য এই টীলার উপরে বসেছি । এবং কিছুক্ষণ পর উড়ে কোথাও চলে যাবো ।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমার বাবা অনেক ধনসম্পত্তির মালিক ছিলেন । নিজে রোজগারও করতেন অনেক । সংসারের সব দিক দিয়েই ছিলো তার আরাম-আয়েস । আমার বাবা বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার ভারটা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন । আমার মন বসলো না

ওসবে । আমি সঙ্গীত-সাধনা করার চেষ্টা করলাম । কিন্তু প্রতিটা রাগ-রাগিনীর নিয়ম-কানুন আমার মন-মস্তিষ্কে যেন শিকল পরিয়ে দিল ।

এরপর আমি মেয়েদের সাথে প্রেম করতে চাইলাম । দূর্ভাগ্য যে, প্রতিটি মেয়ের চেহারা আমার কাছে কেমন যেন পুরনো মনে হলো । মনে হলো যেন বছরের পর বছর আমি তাদের সব রকমের আশা-আকাঙ্খার সাথে পরিচিত কোথায়ও আমি অচেনা, অপরিচিত মুখ পেলাম না-যে আমাকে রহস্যময় পথে নিয়ে যেতে পারে । অতএব আমি চাইলাম বই-পুস্তকে মন সংযোগ করতে । এবং আমার বাবার বিরাট গ্রন্থাগারের অনেক অনেক বই পড়ে শেষ করলাম । প্রতিটি বইকে এক একটি বিশ্বস্ত মানুষের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্ম-অহংকারী বলে মনে হতে লাগলো । প্রতিটা বই কোন না কোন শহুরে সুন্দরীর মত গাঢ় মেক-আপে ঢাকা, মূল্যবান পোষাকে ঝলমল করা হাজার হাজার অপ্সরীর মতো মনে হতে লাগলো । প্রতিটা বই আমার জড়িয়ে যাওয়া মগজ পরিস্কার করতে অপারগ মনে হলে আমি বই ফেলে ছুটে পালিয়ে যাই-এবং আগের চেয়েও বেশী করে নিজের রাজ্যে স্বপ্নের আশ্রয় খুঁজতে থাকি ।
অবশেষে রঙ আমি পেয়ে যাই ।

আর রঙ পাওয়ার সাথে সাথে আমার পৃথিবীটাই যেন পাল্টে যায় । কাগজের পর কাগজ ইজেলে রূপ নেয় । রঙ আর রঙ । সারা ইজেল জুড়ে শুধুই রঙ । রঙের সাথে রঙ মিশে আরেক অপূর্ব রঙের সৃষ্টি হতে থাকে । আমি এখন কাগজের উপর নিজের পৃথিবীটাকে একটা বিন্দুর মত ছোট এবং এই বিশ্বচরাচরের মত সুবিস্তৃত করতে পারি । এই রঙ যা এক জোড়া গোলাপী পদ্মচরণের মত নাচছিলো এবং আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করছিলো । এই রঙ-কখনো কখনো ফুলের মত সুবাস ছড়াচ্ছিল এবং কখনো কোন অজানা রাগিনীর গান শুনাচ্ছিলো এই রঙের পৃথিবী বড়ই রহস্যময় আর অপরিচিত । এবং এই পথে আমার আগামী পদক্ষেপ আগের চেয়েও অনেক আলাদা । প্রতিটি মোড় আলাদা, প্রতিটি চেহারা আলাদা এই রঙের ভেতরে যতই নামতে থাকি-ততই আমার কাছে গভীর মনে হতে থাকে ।
আমি রঙের ভেতর ডুবে গেলাম ।

আমার বাবা এই সমস্ত ছবির কোন অর্থই খুঁজে পেলেন না । কারণ তিনি ছিলেন কাজের মানুষ । তিনি বাস্তবের চক্ষু দিয়ে সাদা চিমনীর ভেতরের আলোকরশ্মিটুকুই শুধু দেখছেন । চিমনীর ভেতরে গিয়ে সেই রশ্মিটুকুতে নিজেকে জ্বালিয়ে কোনদিন পরখ করে দেখেননি । যে আরাম-আয়েসের ভাগ্য নিয়ে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন, সেই আরাম-আয়েসের ভাগ্য তার ছেলের জীবনেও দেখতে চান । এতে তার কোন দোষ নেই । এর বাইরেও যে একটা জীবন আছে, একটা পৃথিবী আছে, তা তিনি জানতেন না । এবং এ কারণেই যে প্রশান্তিমাখা হাসিখুশী জীবনের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন তাই তার ছেলেকে দিতে চাইতেন । তার উদ্দেশ্য ছিল খুবই মহৎ । প্রত্যেক পিতারই উদ্দেশ্য মহৎ হয়ে থাকে ।
বাবা আমার এই সমস্ত রঙের বিভিন্ন কারুকাজ দেখে পুরাকীর্তি বিভাগে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন । আমার

কাজ ছিলো সেই প্রাচীন আমলের বিভিন্ন পুরাকীর্তিগুলোর দেখাশুনা করা এবং তার ছবি এঁকে রাখা । এছাড়া দেশের আনাচে-কানাচে যে সমস্ত প্রত্মতাত্মিক নিদর্শনাদি ছড়িয়ে আছে, তার খোঁজ-খবর নেয়া, সংগ্রহ করা এবং ছবি এঁকে রাখা ।

এ কাজটা আমার কাছে খুব একটা কঠিন বলে মনে হল না । তাই খুশীমনে আমি রাজী হয়ে যাই । এই কাজ করতে গিয়ে সেই প্রাচীন আমলের পুরাকীর্তিগুলোর প্রতি আমি যেন কেমন এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি । এবং আমার সময়ের একটা বিরাট অংশ এই সমস্ত কীর্তি নিদর্শন দেখাশুনা করতে, ছবি আঁকতে আর স্কেচ তৈরী করতেই চলে যায় । ফলে আমার চারপাশ সোজা কথায় গোটা পৃথিবীটাই আমার কাছে যেন অপরিচিত হয়ে গেল । আর অতীতের বিভিন্ন চিত্রাবলী পরিচিত অতি চেনাজানা আপন আপন মনে হতে লাগলো । আর আমি আগের চেয়েও যেন আরও বেশী হারিয়ে যেতে লাগলাম ।

অতীতের বিভিন্ন ভাস্কর্য আমার কাছে নিয়ত যেন জীবিত এবং চলমান হয়ে ধরা দিতে থাকে । কিন্তু আমার বাবা আমাকে বর্তমানের দিকেই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকেন গভীরভাবে । এমন কি দু'তিন জায়গায় বিয়ের কথাবার্তাও চালান । কিন্তু আমি অত্যন্ত কঠোরভাবে তা প্রত্যাখান করি । অবশেষে আমার বাবা-মা হার মেনে চুপ মেরে যান । অবশ্য তারা আশা ছাড়েননি---এটুকুই তাদের সান্ত্বনা যে, ছেলে কাজে মন দিয়েছে, চাকুরী করে । দিনরাত কাজে ডুবে থাকে । উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার প্রতি খুবই প্রসন্ন, পাঁচ বছরে দু'টো প্রমোশন পেয়েছে । এবং নিজের যোগ্যতার বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । প্রতি মাসে বেতনটা মার হাতে তুলে দেয় । কোন রকমের বদখেয়াল তার মনে বাসা বাঁধতে পারেনি । সান্ত্বনার জন্য তো এটাই যথেষ্ট ।

উনিশ'শ আটান্ন সাল ।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাকে অফিসের কাজে বেদরওয়ারাহ যেতে হলো । বেদরওয়ারাহর হিমালয় উপত্যকায় প্রত্মতত্ত্ব বিভাগ কতগুলো নতুন গুহা নিয়েছে । যেখানে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং কিছু চিত্রাবলী পাওয়া গেছে । অফিসের পক্ষ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে সেই সমস্ত প্রাচীন চিত্রাবলীর রঙিন ছবি এঁকে নিয়ে আসার জন্য । কাজটা খুবই সাধারণ । এবং আমার পছন্দমাফিক । এ কাজের জন্য অফিস কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্বাচন করেছেন বলে বেশ পুলক অনুভব করলাম । বাড়ির সবাই তাই । অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় মালপত্র গুছিয়ে আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য প্রস্তুত সবাই । রওনা দেবার সময় মা'র চোখে অশ্রু দেখা দিলে আমি কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে থাকি । কারণ আমার গন্তব্যস্থল ছিল খুবই পাহাড়িয়া এবং দুর্গমপথ । তাছাড়া আমাকে বেশ ক'মাস থাকতেও হবে ।

আলোকপুর পর্যন্ত রেল । আলোকপুর থেকে তিরাহ পর্যন্ত বাস । তারপর আর বাস যায় না । তিরাহ একটি ছোট শহর । এতদ অঞ্চলের শেষ পোস্ট অফিসটা এখানেই অবস্থিত । তিরাহ থেকে বেদরওয়ারাহ গ্রাম প্রায় কুড়ি মাইল দূরে । দুর্গম পাহাড়িয়া পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গল মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । এবং মাঝে মাঝে

উচ্চস্বরে প্রবহমান তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ কোহিস্তানী নদী পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয় । এখানে না আছে কোন সেতু, না আছে সড়ক । ব্যাস-মাইলের পর মাইল শুধু ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে সরু পথ । আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পায়ে চলার পথ । যেখানে ভারবাহী খচ্চরও অতিকষ্টে চলাফেরা করতে পারে । আমি তিরাহ থেকে দুটি খচ্চর এবং চারজন কুলী নিলাম মালপত্র নেয়ার জন্য । এ ছাড়া গাইড হিসেবে নিলাম একজন স্থানীয় লোক । তারপর বেদরওয়ারাহর দুর্গমপথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিলাম ।

প্রথম রাত তিরাহ থেকে সাত মাইল দূরে গরতুন পাহাড়ের চূড়োর কাছে কাটালাম । জঙ্গল এখানেই শেষ । শুরু হয় গরতুনের বরফ-মাথা চড়াই-যেটা একেবারে চূড়োয় গিয়ে ঠেকেছে । ওখানে বেশ বড় একটা গিরিকন্দর আছে-যার ভেতর থেকে স্নিগ্ধ এবং মিষ্টি পানির ছোট একটা ঝর্ণা বয়ে গেছে । এই গিরি কন্দরটা এত বড় যে, ভেতরে আমাদের পুরো কাফেলাটাই স্থান পায় । এক জায়গায় দুটো পাথর বুঝি ভেঙ্গে পড়ে গেছে । জায়গাটা দেখতে মনে হচ্ছিল যেন একটি উনুন । ভেতরে যার তখনো আগুনে পোড়া লাকড়ি রয়ে গেছে ।

এতেই অনুমান করা যায় গিরি কন্দরটা বেদরওয়ারাহ যাবার পথে পথিকরা প্রায়শঃ ব্যবহার করে থাকে । জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠখড় যোগাড় করে কুলীরা রান্নাবান্নার কাজ সেরে নিলো । তারপর আমরা সবাই খেয়ে-দেয়ে সেই কন্দরেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম ।

রাত অনেক হয়ে গেলেও আমার চোখে ঘুম আসে না । জঙ্গলের নীরবতা কখনো কখনো এমন গভীর বোঝা হয়ে আমার বুকে বরফের মত জমতে শুরু করে যে, আমি কেমন যেন হয়ে যাই । কখনো কখনো এই কালো নিস্তব্ধতার মধ্যে অন্ধকার এমন অস্পষ্ট রহস্যময় আর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আমার কাছে ধরা দেয়, মনে হয় যেন চারপাশের সবকিছুই আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কানে কানে কিছু বলছে । কখনো বা জঙ্গলের বুনো বাতাস অশরীরী মূর্তির মতো কঁকাতে কঁকাতে মনে হচ্ছিলো বুঝি ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে । কখনো কখনো বাতাসের চীৎকার এত বেড়ে যায় যেন জঙ্গলের বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার আর গাছপালার সাথে ঝগড়া করছে সে ।

রাতে আমি জানি না কখন যেন আমার চোখ খুলে যায় । আমার কাছে মনে হয় কে যেন ঠান্ডা এক জোড়া নাসারন্ধ্র দিয়ে আমার সমস্ত মাথায় সে এক অদ্ভুত স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে । তপ্ত নিঃশ্বাসের সাথে সাথে আমার মাথা, কপাল, গন্ডদ্বয় শুকছে । আমি যেন কারো চকচক করা গভীর দু'টি চোখ দেখতে থাকি । কিন্তু আমার চোখে এমন গাঢ় ঘুম যে, পুরোপুরিভাবে জেগে উঠতেও পারছিলাম না ।

আধো জাগরণে অথবা স্বপ্নে এই সমস্ত কিছু দেখছিলাম । ফলে সকালে আমার আর কিছুই মনে থাকে না । হ্যা, সকালে আমরা সবাই যখন আবার রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, স্থানীয় অধিবাসী-আমরা যাকে গাইড হিসেবে নিয়েছিলাম, এবং যার নাম মিতা-বললো, 'ফলের ঝুড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না ।' ওই ঝুড়িতে আপেল

ছাড়াও ছিল বাদাম এবং আখরোট । তখনি রাতের ঘটনাটা আমার মনে পড়ে যায় ।
কন্দরের প্রবেশদ্বারে বিরাট একটা হাতের ছাপ পাওয়া গেছে-যা দেখে মিতা বললো, 'বনমানুষ এসেছিলো ।'

এ সময় একজন কুলীর মনে পড়লো, রাতে একটি খচ্চরকে খুবই অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে দেখা গেছে । সম্ভবত সে সময় বনমানুষটা ভেতরে প্রবেশ করে ফলের ঝুড়িটা নিয়ে পালিয়ে গেছে । তবুও খুব ফাঁড়া গেছে, বনমানুষটা কাউকে আক্রমণ করেনি । আমি কল্পনার চোখে সেই বনমানুষটাকে মজা করে আপেল, বাদাম এবং আখরোট খেতে দেখছিলাম যেন । বনমানুষটার চোখ জোড়া খুবই ছোট এবং চকচকে । আর সে সময় বনমানুষটাকে আমার কাছে বড়ই সুখী আর সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছিলো ।
এবং সেই বনমানুষটাকে আমার ভালো লাগতে শুরু করলো । যদি তাকে পেতাম, সত্যিই তার সাথে হাত মেলাতাম-এবং আমরা দু'জন পুরনো বন্ধুর মতো বাদাম, আখরোটের বিভিন্ন উপকারিতা নিয়ে আলাপ জুড়ে দিতাম ।

দ্বিতীয় রাত মানসেহরা নদীর তীরেই কাটালাম । গরতুন পাহাড়ের বিপরীত দিকের কিছু ভয়ানক জায়গা অতিক্রম করে গেলেই চোখে পড়ে মানসেহরা নদীর ছোট ছোট নীল রঙের ফ্ল্যাট । এই নদীর অপর তীর থেকেই বেদারওয়ারাহর পাহাড় শুরু হয় । তারপর বেদারওয়ারাহর উপত্যকা । মানসেহরা নদীর উভয় তীরে জয়তুন এবং বেদারওয়ারাহর পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে দুর্গমগিরি পথ চলে গেছে ।
এখানকার দিনগুলোকেও মনে হয় যেন রাত । ঘন জঙ্গলের ভেতর সূর্যের আলোকরশ্মিটুকু কোথায় যে লুকিয়ে ফেরে বোঝা মুশকিল । আর মানসেহরা নদী এই দুই পাহাড়ের মধ্যখান দিয়ে গলিত বরফের নীল চাদর গায়ে জড়িয়ে যৌবনের ভারে বিচলিত চঞ্চলা তরুণীর মতো কল কল ছল ছল ছন্দে গান গাইতে গাইতে কোথাও কোন সুদূরে চলে যাচ্ছে । বশীভূত করার মতো কেউ নেই যেন । এর তীরে না আছে কোন ধানক্ষেত, না আছে ভূট্টার ক্ষেত । দুই-তীরে চাক্ষুষ দু'টি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে । এবং রক্তপিপাসু দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকেই যেন দেখছে । আর এই দুইয়ের মাঝখান দিয়ে মানসেহরা নদী কোন দুই চঞ্চলা পাহাড়ী তরুণীর মতো হাসতে হাসতে নাচের ভঙ্গীতে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে ।
মানসেহরা একটি ছোট্ট কুমারী নদী । কৃষকরা এই নদী থেকে পানি নেয় না । শস্যক্ষেতগুলো এ নদীর পানিতে নিজেদের পিপাসা নিবারণ করে না । এর দুই তীরে কোন 'পান চাক্কি' নেই । কোন গ্রাম নেই । দূরে, অনেক দূরে গিয়ে এই নদী হয়তো বড় হবে, যুবতী হবে । কোন যুবক কৃষক হয়তো ওর সাথে প্রেম করবে । ওর মাথায় বাঁকা অলঙ্কারের তাজ পরাবে । মেয়েরা ওর তীরে নেচে নেচে গান গাইবে । আতশবাজি জ্বালাবে, ফুল দিয়ে সাজাবে । এবং ওকে পালকীতে বসিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে যাবে । কিন্তু এখনো তো সে কুমারী ।

মানসেহরা নদীর তীরে সন্ন্যাসীর একটা কাফেলা এসে থামলো । ওরা আমাদের চেনে না । আমরাও ওদের চিনি না । কিন্তু রাতে আমরা পরস্পর অতি নিকটে চলে এলাম । আমাদের কাছে যা কিছু ছিলো ওদের দিয়ে

দিলাম । ওদের কাছে যা কিছু ছিলো আমাদের দিয়ে দিলো । সম্ভবতঃ এক রাতের পরিচয় এবং মিলন সারাজীবনের মিলনের চেয়েও গভীর হয়ে থাকে । কেননা কাল সকালে আমরা সবাই আপন আপন গন্তব্যে চলে যাবো । বিচ্ছেদ যেখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয় প্রেম-ভালোবাসা সেখানে দৃঢ় হয় । এক একটা মুহুর্ত তখন খুবই মূল্যবান মনে হয় । রাতে সরসা আর তামিনী বেশ নেচেছিলো । লাভু এবং কুমনীও গান গেয়েছিলো । আর সেই বুড়ো সন্ন্যাসীটা যে কিনা বাঁশী বাজিয়ে ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন মানসেহরা নদীর সে-ই জন্মদাতা ।

পাহাড়ী গান আমি একদম বুঝি না । কিন্তু গান কি শুধু কথা দিয়েই বোঝা যায় ।

সুর ? সুর কি কিছুই বলে না ? আর সেই সুরেলা কণ্ঠস্বর-যা কোনো স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত হয় ? এবং সেই গভীর এক জোড়া চোখ যার ভেতর শতাব্দীর অনেক পুরানো না বলা কথা লুকিয়ে আছে-।যখন একজন পুরুষ আর নারীর মধ্যে স্রেস একটা পূতঃপবিত্র আবেগের জন্ম নেই যে আবেগের মধ্যে কোন ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই , বিষয় সম্পত্তি নেই-।এবং কেউ কাউকে জিঞ্জেসও করেনা , তোর বংশ পরিচয় কি , তুই আমাকে কি দিয়েছিস, আমি তোর কাছে থেকে কি নিয়েছি । ওদের সাথে গান গাইতে , খাবার খেতে খেতেই যেন চোখে চোখ রেখে এক অদ্ভুত স্বপ্নের দেশে নামতে থাকি । তখন আমি ওদের সাথে এক আশ্চর্য নৈকট্য অনুভব করি । অপরিচিত আগন্তুকদের সাথে এ জাতীয় নৈকট্য আমার প্রায়শঃ ঘটে । কিন্তু কেন ? এই শ্যামবর্ণা সুন্দরীদের হাসির যাদুতে আমি প্রায় সময় কেমন যেন জড়িয়ে পরি । ভালোই হলো সাতসকালে ঘুম ভাঙ্গার আগেই সন্যাসীর কাফেলাটা কোথায় চলে গেছে । আর আমার জন্য রেখে গেছে একটি রাতের মিষ্টি মধুর কিছু স্মৃতি এমন স্মৃতি যা সম্ভাবতঃ আরেক জনমে কোধ অজানা অচেনা দ্বীপে কাটায়ে এসেছি আমি । কেন এমন লাগে , যেন ওদের সাথে আমার খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল যার সঠিক বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয় ।

পরদিন বেদরওয়রাহ পাহাড়ের গিরিপথ দিয়েই আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলাম । কিন্তু মনটা বার বার মানসেহরা নদীর তীরে ফিরে আসতে চাইছিলো । যেটা আমরা দুরে অনেক দুরে পেছনে ফেলে এসেছি । বেদরওয়রাহর জঙ্গলগুলো খুবই ঘন এবং পুরনো । আর মানুষের পদচারণা এখাধে খুব কম পরে বলে মধে হচ্ছিলো ।

যে রকম নির্ভিক দৃষ্টি দিয়ে জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারগুলো আমাদের দেখছিলো ওদের ওই নির্ভিক দৃষ্টিই যেন জনান দিচ্ছে , এখানে শিকার করা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ । এই দৃষ্টি যে মনুষের পশুত্বের পরিচয় সম্পর্কে এখনো অনবহিত তা বলাই বাহুল্য । সত্যিই মতটা একরাশ প্রশান্তিতে ভরে যায় । ভেবেছিলামা দুপুর নাদাদ গন্তবে পৌঁছে যাবো । কিন্তু জঙ্গল এতো ঘন এবং পথ এতো দুর্গম যে, বেদরওয়ারাহ পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত পৌঁছতেই আমাদের দুপুর হয়ে যায় । চুড়োয় উঠলে বেদরওয়ারাহ উপত্যাকার মনোমুদ্ধকর দৃশ্য চোখে পাহাড় এখানে অসে ঢালু হয়ে উপত্যকা যেন দিগন্তের সাথে মিশে গেছে । সেই দিগন্তে দুটি রূপালী নদী ভাগ্যের রেখার মত ধান খেতের উপর দিয়ে চলতে চলতে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে এসে এক হয়ে যায় । তার

মাঝখানে উঁচু মতো জায়গাটায় একটু টিলার সৃষ্টি হয় । সেই টিলার উপরেকটি প্রাচীধ রাজপূতী কারিগরদের নির্মাণ করা কিল্লা চোখে পড়ে ।উভয় নদী ওয় কিল্লাকাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে মিলে এক হয়ে যায় তারপর আবার ধান ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে । ছড়িয়ে পড়তে পড়তে আবর এক জায়গায় গিয়ে মিলিত হয় নদী দুটি । এখানে উভয় নদীর মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপ গড়ে উঠে যার ভেতর গাছপালায় ঘেরা একটা পুরনো মন্দির দেখা যায় । এবং এই কড়া রোদে সেখানকার পিতলের কলসগুলো সোনার কলসের মতো ঝকমক করছিল । ধান ক্ষেতের উপরেই উপত্যকার উপর বেদরওয়ারাহর ছোট গ্রাম । এর দক্ষিণে পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কালো কালো দাগের মত গুহা দেখা যাচ্ছিল । সম্ভাবতঃ এই সেই গুহা যার রঙিন ছবি একে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে এতোদুর পাঠানো হয়েছে । এই গুহাগুলো সম্পর্কে জিঞ্জেস করলে আমার অনুমান সত্য প্রমাণিত হয় ।

কিন্তু এতো উচু এবং দুর থেকে দেখার দরুদ আমার কাছে সব চাইতে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল সেই রাজপূতী কিল্লাটা যেটা - একটি উচু টিলার উপর দাড়িয়ে ছিল । মনে হচ্ছিল যেন কিল্লাটা পুরো উপত্যকা জুড়ে প্রভাব বিস্তার করে আছে ।

কিল্লাটার দেয়াল গুলো প্রচীন মনে হচ্ছিল । এবং অনেক শেওলা জমে আছে । যার দরুন কিল্লাটার রঙ পাথুরে রঙের পরিবর্তে হলকা সবুজাভ দেখাচ্ছিল । যেন কিল্লাটা বিভিন্ন লতাগুল্ম , ডজন ডজন পুদিয়া এবং আঙ্গুরের লতিয়ে যাওয়া লতাপাতার মত প্রকৃতির নিয়মে টিলার জঠর ফুরে বেরিয়ে এসেছে । এবং মুলতঃ এর নির্মমান্কার্যে মানুষের হাত অথবা মস্তিত প্রসূত কোন কিন্তা ভাবনাই যেন কার্যকারী নয় । কিল্লাটা সত্যিই মনটাকে এক অদ্ভুত মন্ত্রমুদ্ধ করে রাখে ।

আমি জিঞ্জেস করলে মিতা বললো , 'সাহেব, বহু পুরানো কিল্লা এটা । অর্ধেকটারও বেশী অতিমধ্যেই ধ্বসে গেছে । মোগর আমলে ওই বংশের একজন বিদ্রোহী নাকি পালিয়ে এসে এই উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন । তিনিই এই কিল্লাটা নির্মাণ করান । এখন আর সেই বংশের কেউ বেচে নেই । ইংরেজ আমলে কিল্লাটার অনেক সংস্কার সাধিত হয় । কারন অনেক ইংরেজ শিকার করার জন্য এদিকে আসতেন । দেশ স্বাধীন হবার পর আর কিল্লা সংস্কারের কথা কেউই খেয়াল- করেন নি । বছর । কয়েক হলো সরকার এদিকে মনোযোগ দিয়েছেন । এবং কিল্লাটার বাকী অংশ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে । এখন এটায় দেখাশুনা চলছে । কিন্তু সেই পুরনো রূপ এখন আর কোথাই .....? যা আছে তাও আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু বিলীন হতে হতেও একশ দেড়শ বছর তো চললো ।

কড়া দুপুর । সমসতটা উপত্যকা জুড়ে রোদের সোনালী রঙ চকচক করছিল । উপত্যকা যেন প্রকৃতি তৈরি করা তৃণভূমির মতো একরাশ প্রশান্তির কোলেঢলে পড়ছে । প্রথম দর্শনেই বেদরওয়ারাহ আমার কাছে ভালো লাগতে শুরু করে । পরে মিতা সবাইকে ইশারা করলে আমাদের কাফেলা উপত্যকার দিকে নামতে থাকে । সূর্যাস্থের সাথে সাথেই উপত্যকায় পা রাখলাম । ধানের সবুজাভ শীষ চোখে নেশা ধরিয়ে দেয় । জায়গায় জায়গায় নানান ধরনের গাছযেন কোন জনপদ মাথা গাছালির স্তুপ দেখে মনে হচ্ছিল-

তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর অপরিচিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দেখছে কিল্লায় প্রবেশ করার আগে একটি ছোট পুল পার হতে হলো। পুল পার হবার পর ইট বেরিয়ে পড়া বড় একটি কংক্রীটের দেয়ালের পেছনেই কিল্লার দরোজা। এবং আমারা কিল্লার ভেতরে প্রবেশ করতেই বাইরের পৃথিবী যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

চারিদিকে গভীর অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। আর পুরনো কোন পরিত্যাক্ত বাড়ীর অদ্ভুত এক রকমের গন্ধ এসে আমার নাক স্পর্শ করে যায়। আমার চোখজোড়া আপনা থেকেই বুজে আসে। এবং চোখ খুললে আমি নিজেকে কিল্লার বেশ বড়সড় একটি হলঘরে আবিষ্কার করি। যার দেয়ালের স্থানে স্থানে হরিণের শিংওয়ালা মাথা ঝুলে আছে। হলঘরের ঠিক মাঝখানে কাঠের একটা বড় স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। এবং ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখি পাথরের ছাদের সাথে কাঠের আরেকটি ছাদ লাগানো। সেখানে প্রাচীন কারুকার্যের নিদর্শন দেখা জাচ্ছিলো।

আমার দেখা ওটুকুনই – এর মধ্যে দেখি একজন লোক লন্ঠন হাতে হলঘরের সামনের সিঁড়ির উপর থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ। পরে মিতাকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

লোকটা কিল্লার পাহারাদার। বাবুর্চি বলুন, আরদালী বলুন আর বেয়ারা বলুন, সবই ওই লোকটা। বয়েস পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। তাকে যখন প্রথম সিঁড়ির উপর দাঁড়ানো দেখি, তার ঘন ভ্রুজোড়ার নীচের একজোড়া চোখে গভীর স্থিরতা লক্ষ্য করি আমি। চওড়া কাঁধ এবং কঠিন বুকে কোন জংলী গরিলার মতো দেখতে মনে হয়েছিলো তাকে। কিন্তু জানি না তার প্রতি আমার এই ধারণা জন্ম নিলো কেন।

কিন্তু যখন সে কাছে এলো পরমুহূর্তেই মনে হলো আমার ধারণা ভুল। তার কাঁধ একটু ঝুকানো ছিলো এমন ঝুকানো যে, ওর কঠিন বুকের কোন পরিচয়ই আমি পেলাম না। এবং লোকটার পাকানো গোঁফ জোড়ার কোণে কোণে বছরের পর বছরের মিনতি, কৃতজ্ঞতা, এবং জ্বী-হুজুরীর প্রকাশ ছিলো। আর মিতা যখন তাকে জানালো 'আমি কে এবং কেন এসেছি', তখন লোকটা হাতের লন্ঠন মেঝেতে রেখে ঝুকে পড়ে দু'হাত জোড় করে আমাকে বড়ই বিনীতভাবে সালাম করলো। পরে আমার জন্য স্নানের পানি গরম করতে চলে গেলো।

লোকটা চলে যাবার পর মিতা বললো, 'ওর নাম শংকর। বহু পুরনো বেয়ারা। ইংরেজ আমল থেকে কাজ করছে। আমার মনে হয় বিশ-পঁচিশ বছর ধরে ও এখানে আছে। তা কাজ জানে বটে লোকটা। সাহেবরা তার প্রতি খুবই প্রসন্ন। তবে একটু লোভী।'

'এক-আধটু লোভ তো সবার মধ্যেই থাকে।' – আমি বললাম।

পরে আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে মিতা, কুলী এবং অন্যান্যদের হিসাব-নিকাশে মনোযোগ দিলাম। হিসাবপত্র চুকিয়ে মিতাকে পাঁচ টাকা আর অন্যান্যদের দু'টাকা করে বখশিস দিলে ওরা আমাকে সালাম দিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

অন্ধকার বেশ জেঁকে বসতে শুরু করলে আমি মিতাকে ডেকে বললাম, 'এতো রাতে তোমরা কোথায় যাবে? তারচে রাতটা এখানেই থেকে যাও, কুলীদেরও বলে দাও।'

ওরা আমার কথা শুনে চমকে উঠলো। নীরবে পরস্পরকে দেখতে থাকলো। মিতা ঘাবড়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললো, 'না হুজুর, আমরা চলে যাবো।'

'কিন্তু যাবে কোথায় এখন?'

'নীচে গ্রামে যাবো।' – একজন কুলী বললো।

'নীচে গ্রামে যাওয়ার চাইতে এখানেই পড়ে থাকো, খাবারও পাবে।' – আমি বললাম।

খাবারের কথা শুনে কুলীগুলোর চোখজোড়া মুহূর্তের জন্য চক চক করে ওঠে। কিন্তু পরে আবার ভয়ার্তচোখে ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এবং এবার সবাই সমস্বরে অস্বীকৃতি জানায়।

'এবার আমাদের বিদায় দিন হুজুর ।'- মিতার কণ্ঠে যেন একরাশ আকুতি ঝরে পড়ে।

'ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো মনে করো ।' – আমি ওদের বিদায় দিলাম ।

ওরা তারাতারি 'সালাম হুজুর, রাম রাম' বলতে বলতে বিদায় নিয়ে দ্রুত হলঘর ত্যাগ করে চলে যায় ।

সবার শেষে মিতা রয়ে গেলো । আমার মনে হলো যেন সে কিছু বলতে চায় । কিন্তু পরমুহুর্তে সে ইচ্ছা যেন ত্যাগ করে । এবং আমকে কিছু না বলেই সেও 'রাম রাম' বলে চলে যায়। আর আমি সেই পুরনো কিল্লার হলঘরে একা, সম্পূর্ণ একা রয়ে গেলাম।

কেন ওরা তারাতারি এই কিল্লা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে, ওরা চলে যাবার পর ব্যাপারটা আমি অনুভব করতে পারি । কিন্তু ওদের ভয় পাবার ব্যাপারটা কিছুতেই আমার বুঝে আসে না ।

তিনদিন আমারা একসাথে ছিলাম । এখানে রাতটা ওদের কাটিয়ে যেতে বলেছিলাম এজন্যে যে, রাত ক্রমশঃ গভীর হচ্ছিলো । পাহাড়ী ঠাণ্ডা ছাড়াও ছিলো বিভিন্ন রকমের আপদ-বিপদ । তাছাড়া নিঃসঙ্গ এই জঙ্গলে আরও

একটি রাত ওদের নৈকট্য লাভ করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য । নতুবা একটি রাতের জন্য ওদের কিল্লায় রেখে নিজের পয়সা খরছ করে খাওয়াবার কি প্রয়োজন পড়েছে আমার ? সত্যিই এসব পাহাড়ী লোকগুলো বড়ই অদ্ভুত ।

টা যাক । ও নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি মালপত্রের দিকে মনোযোগ দিই । মালপত্র সবই ঠিক আছে । অনেকটা আশস্থ হয়ে আমি এবার হলঘরে চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম । আমি একা । এতো বড়ো হলঘরে বসার কোন ব্যবস্থা নেই । আমার সামনেই সিরি – যেটা ঘুরতে ঘুরতে উপরে কিল্লার প্রথম তলায় গিয়ে ঠেকেছে ।

উপর তলার দিকে পিঠ দিয়ে আমি সিঁড়ির গোরায় বসে পরি । যাতে সামনে কিল্লার দরোজা এবং হলঘরে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা মালপত্রগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে পারি। নিঃসঙ্গতার দরুন আমার বেশ ভয়ও লাগছিলো । অন্ধকার এবং নিস্তব্ধটা একে অপরের পেছনে যেন ছোটাছুটি করছিলো । তবুও কিল্লাটার এই পরিবেশ এমন একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিলো-যার দরুন আমি কেমন মনমরা হয়ে পড়ি । প্রতিটি অট্টালিকার নিজস্ব একটা মাহাত্ম্য তো থাকেই ।
সন্দেহ নেই, এই অট্টালিকাও কোন মানুষেরই তৈরী। কিন্তু বহু বছরর অব্যবহারের দরুন জীবিত প্রাণীর মত এরও আলদা একটা মহাত্ম্য এবং পভাব গড়ে উঠে। এটা মানুষের অবচেতন মনকে প্রভাবিত করে। এই প্রভাব কখনো ভালো হয়ে দেখা দেয়, কখনো বা খারাপ।

শুরুতেই কিললাটার প্রতি আমার অদ্ভুত এক ধারনা মন গেড়ে বসে। কেমন যেন অপছন্দ ভাব, মনমরা ভাব। অথচ পুরো কিল্লার কিছুই তখনো আমার দেখা হয়নি। কিল্লার একটিমাত্র হলঘরই আমি দেখেছি। এর অপর অংশ সম্পর্কে আমি এখনও পুরোপুরিভাবে অজ্ঞ। সত্যিই কিছু বুঝে আসছেনা ।

এই রকম কেন হল? কিন্তু এ মুহুর্তে ব্যাপারটায় কোন গুরুত্বই দিতে চাইলাম না। হয়তো এ সবকিছু দীর্ঘ ভ্রমনের বিষন্নতা এবং পরশ্রম কাতরতা থেকে হয়েছে। কোন অপরিচিত পরিবেশে প্রথম পা দেয়ার ফলে সাধারনতঃ যা হয়ে থাকে—এক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেই আমি। এবং দৃষ্টটা সামনের দেয়ালে ছুড়ে দিলাম—যেখানে অন্ধকারেরমধ্যে শিংওলা একটা হরিণের মাথা আটকানো ছিল। অন্ধকারের মধ্যে মাথাটা লম্বা লম্বা শিং উঁচিয়ে অস্পষ্ট এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন চোখজোড়া খুলে যেন পিউ পিউ করে তাকিয়ে আছে। তারপর হঠাৎ যেন সেই হরিণের চোখে আলো ঠিকরে উঠে। বড় বড় চোখজোড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে চকচক করত থাকে।

আমি একেবারে চমকে উঠি। গভীরভাবে হরিণের চোখ জোড়া দখতে লাগলাম। সেই চোখজোড়া সত্যিই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিলো। সেই মৃত চোখজোড়া যেন ক্রমেই আরও লাল টকটকে হয়ে উঠছিলো।

আমর দেহ কাঁটা দিয়ে উে। আর আমি সেই সিঁড়ির উপরই যেন জমে যেতে থাকি। আমার চোখজোড়া হরিণের চোখের উপরই নিবদ্ধ। একসয় আমার পেছনে সিঁড়ি ভাঙার আওয়াজ এলে আমি ঘাবড়ে গিয়ে সিঁড়ি থেকে একদম লাফ মেরে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই তীব্র একটা টর্চের আলো আমার চোখ ধাধিয়ে যায়। পরে আমার কানে যেন অনকদূর থেকে কাঁপা কাঁপা একটা আওয়াজ ভেসে আসে।

'সাহেব, গোসলের পানি তৈয়ার আছে'

শংকরের গলা। সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে শংকর। হাতে একটি টর্চ। অনেক কষ্ট চিৎকারটা রোধ করি আমি। শংকর আমার সামনের দরজা দিয়েই কিল্লার বাইরে চলে গিয়েছিলো। কিনতু এখন আমার পেছনে সিঁড়ির উপর এলো কিভাবে ?

বিস্ময় ক্রমশঃ াড়তে থাকে। কিন্তু আমি এই বিস্ময় এবং ভয় ভয় ভাব সামলে নিয়ে নীরবে, নিঃশব্দে উপরে উঠতে থাকি। সঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখি একাশ অন্ধকারে ছেয়ে আছে গোটা হলঘর। হরিণের চোখজোড়াও নিস্প্রভ এবং মৃত। সম্ভবতঃ টর্চের আলো পড়ে চোখজোড়া উজ্জল এবং র্তের মতো লাল দেখাচ্ছিলো তখন।

এই কথা ভেবেই মনটা আমার একরাশ প্রশান্তিতে ভরে যায়। খুশীমনে শংকরের পেছন পেছনে হঁটতে থাকি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা কাঠের বারান্দা পার তে থাকি। কাঠের তক্তার উপর আমাদের পায়ের আওয়াজ কেমন যেন অদ্ভুত ভীতিপ্রদ। চতে চলে ডানে ঘুরে গিয়ে একটি ক্ষের সামনে এসে শংকর দাড়িয়ে যায়। দরজা খোলা ছিলো। ভেতর থেকে লন্ঠনের আলো যেন উঁকি দিয়ে আমাদেরই দেখছিলো।

লন্ঠনের কাঁপা কাঁপা ঝলমল করা আলোয় আমি সেই কক্ষটার সাধারণ একটা জরিপ করে নিই। কাঠের নকশা করা ছাদ। মেঝে ও কাঠের দেয়ালের অর্ধেকটা মেহগনী গাছের তক্তা দিয়ে মোড়া---যার গাঢ় রঙ একরাশ ময়লা পড়ে কলো হয়ে গেছে।

এক কোণে মেহগনী কাঠের বড় একটা পালঙ্ক। অপর কোণে

ড্রেসিং টেবিল এবং দুটি ইজিচেয়ার ।একটা লম্বা তেপায়া ।আর একটা ছোট তেপায়া - যার উপর ছোট একটা চীনা ফুলদানি শোভা পাচ্ছিলো ।এর বিপরীত দিকে একটা জানালা - যার উপর ছাই রঙের পুরু পর্দা ঝুলছে ।একপাশে মালপত্র রাখার একটা কাঠের রেক । দক্ষিণ দিকে একটা দরজা - যেটা বাথরুমে যাবার জন্য ব্যাবহ্রিত হয় ।কক্ষটা দেখে মনে হল যেন অনেক দিন থেকে ঝাড়া - মোছা হয় না ।

শঙ্কর অপারগতা প্রকাশ করে বলে - ' সাহেবের আসার কোন খবর পাইনি । নতুবা সবকিছুই ঠিকঠাক পেতেন । আমি গোসল খানায় গরম পানি দিয়েছি । ঠাণ্ডা পানিও দু বালতি দিয়ে এসেছি । হবে তো ? '

'হবে।' - আমি বললাম ।

'গোসলটা সেরে নিন - ততক্ষণে আমি খাবারের ব্যাবস্থা করি ।' - বলেই শঙ্কর কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । পড়ে তীব্রদৃষ্টিতে আমাকে দেখে - যেন আমার অভিপ্রায় জানতে চাই ।

বলে , 'সাহেব কি ডিনার খাবেন ? ভেজিটেবল না নন- ভেজিটেবল ?'

'আমি সবকিছুই খাই ।সহজে যেটা পাওয়া যায় , তাই দাও ।'

'ঠিক আছে সাহেব ।'- বলেই শঙ্কর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় ।কিছুক্ষণ পর আবার আমার মালপত্র উপরে নিয়ে আসে ।তারপর ডিনার তৈরি করতে শুরু করলে আমি তাড়াতাড়ি মালপত্র গুলো খুলে ফেলি ।

স্নান করার কাপড় চোপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যাই আমি।নতুন তোয়ালে , কামিজ , পাজামা বাথ্রুমার স্ট্যান্ডে রেখে টবে বসে স্নান করতে লাগলাম ।আমার সামনের দেয়ালের উপর লম্বা বেঢক অন্ধকার ছায়াও বড় উপহাস্য ভঙ্গিতে স্নান করছে মনে হল যেন ।এবং আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নকল করছে যেন ।আম মগ ওঠালে সেও উঠায় । আমি হাত নিছে রাখলে সেও রাখে ।আমি মাথায় পানি ঢাললে সেও পানি ঢালে । আমি শরীর ডললে সেও ডলে । আমি দেয়ালের ছায়াটা দেখার জন্যে হটাত থেমে গেলে , সেও তাই করে ।এবার আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে থাকি ।আমার মন চাই এমন কিছু করি - যা সে করতে পারেনা ।কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব হল না ।আমার সমস্ত কার্যকলাপ অবিকল নকল করতে থাকে সে ।যেন সেও আমার মত সব কিছু করতে প্রস্তুত ।মানুষ চাঁদ জয় করতে পারে , কিন্তু নিজের ছায়াকে পরাজিত করতে পারে না ।

স্নান সেসে মাথায় চিরুনি বুলিয়ে শোয়ার পোশাক পড়ে আমি ডিনারের জন্য প্রস্তুত হলাম ।স্নান করার দরুন শরীরটা যেন বেশ হালকা হল কিন্তু ঘুমের ভারে চোখজোড়া যেন খুলতে পারছিলাম না । বারবার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছিল ।

মন চাইছিল তাড়াতাড়ি খাবার খাবার খেয়ে বিছানার আশ্রয় নিই । তিনদিনের ভ্রমণে এমনিতেই শরীরটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে ।

একটা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম । চেষ্টা মানে স্রেফ পাহাড়ের পর পাহাড় চোখে ভাসছিল আমার ।মনোযোগ একটু হালকা হালকা করলেই বইয়ের পাতার শব্দ গুলো চোখের সামনে দুষ্টু ছেলের মত নাচতে শুরু করে যেন । এবং শব্দগুলোর নিষ্প্রাণ লাফালাফির মধ্যে অর্থ আর ব্যাখ্যা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায় । প্রায় একঘণ্টা পর যখন শঙ্কর - 'খাবার তৈরি সাহেব'- বলতে এলো , তখন দ্রুত উঠে দাঁড়াই আমি ।

খাবার ঘর বেশি দূরে নয় । বাম দিকে একটা বন্ধ কামরা ছিল । তার পাশের কামরাটাই খাবার ঘর ।

মেহগনি কাঠের ছাদের সাথে লটকে থাকা একটি পুরনো আমলের ল্যাম্প জ্বলছিল । নিচে গল মজবুত টেবিল । টেবিলটার উপর একসাথে আটজন খাবার খেতে পারে ।এখন সেখানে মাত্র এক জনের খাবার সাজানো হয়েছে । সুস্বাদু টমেটো সুপ , চিকেন কোর্মা , পরাটা , দাল এবং ভাত । বড় তৃপ্তির সাথে খেলাম ।প্রথম মনে হয়েছিল খুব ঘুম পেয়েছে । এখন মনে হচ্ছে খুব ক্ষিধাও পেয়েছে । এবং পেটপুরে খাবার দরুন মনে হচ্ছিলো যেন ঘুম ঘুম ভাবটা আরও গম্ভীর হয়ে চোখে নেমে আসছে । খাবার টেবিল থেকে উঠার সময় শঙ্করের রান্নার বেশ প্রশংসা করলাম এবং একটি টাকাও বখশিশ দিলাম । পড়ে তাকে তাড়াতাড়ি বিছানা সাজাতে বলে দিই । তখন আমরা কথা বলতে বলতে নিজের কক্ষে চলে এসেছিলাম ।

' সাহেব কি এখানেই শোবেন ?'- শঙ্কর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে ।

'হ্যাঁ ।'

'এই কামরায়?'

'হ্যাঁ , এই কামরায় - কিম্বা অন্য কোন কামরায় । অবশ্য যদি এর চেয়ে ভালো হয় ।'

'সবচেয়ে ভালো কামরা তো এটাই সাহেব । কিন্তু- বলতে বলতে থেমে যায় শঙ্কর ।

'কিন্তু কি?'

'এই কিল্লায় রাত্তিরে কেও থাকে না ।'

'তুমি কি রাতে এখানে থাক না ?' - আমি জিজ্ঞেস করি ।

'না সাহেব । আমি তো নিচের ডাকবাংলোয় থাকি ।'

'তুমি আজ রাতে এখানেই থেকে যাও ।'

'না সাহেব । ' - সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে , 'আমি ওখানেই থাকব । এবং আমার অনুরুধ , হুজুর রাতটা ওখানেই থাকুন । পরে সকালে চলে আসবেন ।'

'কিন্তু কেন?'- আমি জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করি ।

'সাহেব..... ' শঙ্কর কিছুটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ।বলে 'এই কিল্লায় গত নয় দশ বছর থেকে রাতে কেও থাকেনা । '

'থাকে না কেন?'- আমি আবারো জিজ্ঞেস করি ।

'সাহেব লোকে বলে এই কিল্লায় ভূত আছে ।'

'ভূত!'

শঙ্কর কোন কথা বলে না। শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে ।

'তাহলে তো আমি এখানেই থাকব । ' সিদ্ধান্ত সূচক স্বরে আমি জবাব দিই , 'ভূতে আমি ভয় পাই না ।'

শঙ্কর হাত জোর করে । অত্যন্ত ভয়ার্ত স্বরে কাতর মিনতি জানায় , 'সাহেব , জিদ করবেন না ।আমি জোর হাতে বলছি , নিচে নতুন ডাকবাংলোয় চলুন । এটা আমার মিনতি । আজ থেকে সাত বছর আগে একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও এমনি জিদ করেছিলেন । মাত্র দুতিনদিন এই কামরায় থাকতে পেরেছিলেন । চতুর্থ দিন এই বিছানাতেই তার লাশ পাওয়া যায় ।'

'ভূতে মেরে ফেলেছিল ?'

'আমরা পাহাড়ি লোকেরা তাই মনে করি ।কিন্তু তিরাহর ডাক্তার সাহেব জানালেন - হার্টফেল করে মরেছেন ।'

'ডাক্তার ঠিকই বলেছেন ।'

'আমি আপনার পায়ে পরছি হুজুর , রাতে এখানে থাকবেন না ।'

'এখন তো আমি এখানেই থাকতে চাই শঙ্কর ।' আমি বলি 'এখনো পর্যন্ত ভুতের সাক্ষাত পাইনি আমি ।এই সুজুগে শব্দটা পুরো হয়ে যাক । তুমি এখন যাও , সকালে এস কিন্তু ..... '

আমি কোন রকমেই ওর কথা শুনলাম না । অগত্যা কিল্লার দরজার সবগুলো দিয়ে যায় শঙ্কর । লন্ঠন দিয়ে ওকে দরজার বাইরে পৌঁছে দিতে গিয়ে লক্ষ করি , বেচারা শঙ্কর খুব ঘাবড়ে গেছে । শুধু তাই নয় , দুঃখও পেয়েছে । আমি ওকে ভরসা দিয়ে বিদায় করলাম ।

বড় দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল । শঙ্করকে বিদায় দিএয়াবার দরজাটা ভেতর থেকে ভালো করে তালা মেরে চাবিটা পকেটে পুরে হলঘরে এলাম ।তারপর লন্ঠনের আলোয় হরিণের

মাথাটা গম্ভীরভাবে দেখে নিজের বোকামিতে নিজেই একচোট হেসে ওখান থেকে চলে এলাম।

আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে কাঠের বারান্দা পেরিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করি আমি।তার আগে পাশের কক্ষটা ভাল করে দেখে নিই।

এরপর নিজের কক্ষে ঢুকে ভেতর থেকে ভাল করে দরজা বন্ধ করে দিই আমি।দুটো ছিটকিনিই আটকালাম।তারপর শিকল মেরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাথরুমে প্রবেশ

করলাম।বাথরুমটার দুটো দরজা ছিল।একটা আমার কক্ষের সাথে লাগান,অপরটা পাশের কক্ষের সাথে। মনে হচ্ছিল বাথরুমটা দুই কক্ষের লোকদের ব্যাবহার করার মত করে তৈরি করা হয়েছে।তবে পাশের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

দ্বিতীয় কক্ষের দরজাটাও বাহির থেকে ছিটকিনি মারা।পশ্চিমে যে জানালাটা ছিল সেটাও উপর নিচে ছিটকিনি মারা।আমি পুরো বাথরুমটা চেক করে অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে আসি।আমার কক্ষ সংলগ্ন বাথরুমটার দরজা বন্ধ করা যায় না।তাই ওটা এমনি ভিড়িয়ে দিলাম।তারপর পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে বই পরতে লাগলাম।ঘুম জেন কোথায় উরে গেছে।বারবার এক অজানা ভয়ে গা কাটা দিয়ে ওঠে।আবার অদৃশ্য ভুতের সাথে সাক্ষাত করার দুর্নিবার বাসনাও সমস্ত দেহমনে অদ্ভুত রকম শিহরণ জাগিয়ে তোলে।ভয়অজে করছে না তা নয়।অনেকক্ষণ বই নিয়ে পড়ে থাকলাম।সময় সময় চোখ বুজে আস্তে চাইলে চমকে উঠে সাবধান হয়ে যাই।প্রায় দুটা পর্যন্ত ঘুমের সাথে যুদ্ধ করে জানি না কখন আমি ঘুমের ঘরে ঢলে পরি।ঘুমের ঘোরেই কাধ বদল করে বইএর উপর মাথা রেখে ঘুমাতে থাকি।অকস্মাৎ ঘুটঘুটে আঁধারের মধ্যে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।লন্ঠনের আলো কখন যেন নিভে গেছে।তেল ফুরিয়ে গেছে হয়ত।দরোজার বার থেকে মৃদু শব্দ শনা যায়।কে যেন সতর্ক পায়ে আমার দরজার দিকেই আসছে।তারপর একসময় হঠাৎ তীরবেগে কাঠের বারান্দায় এসে থেমে যায় যেন ।

এরপর নীরবতা নিস্থব্ধতা বিরাজ করতে থাকে।সে প্রায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত।আমার কাছে মনে হল যেন সবই স্বপ্ন।জা কিছু শুনেছি স্বপ্নের ভিতরেই সুনেছি হয়ত। অথবা আমার শোনার ভুলও হতে পারে।

অতএব আমি আবারো শুয়ে পরার উদ্যোগ করছিলাম,এসময় কে যেন বার থেকে আমার কক্ষের দরজাটা আস্তে আস্তে অতি সাবধানে ভাঙ্গার চেষ্টা করে।খটাখট খটাখট আওয়াজ আসছে।

আমি উঠে বিছানায় বসে পরি। এবং একটা হাত দিয়ে বালিশের নিচ থেকে টর্চ বের করে নিই।দ্বিতীয় হাট দিয়ে দেয়ালের কাছে থাকা থ্রি নট থ্রিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে দাড়াই।তারপর আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ছিটকনি আলগা করে দরজা খুলে বাইরে টর্চের আলো ফেললাম।

কক্ষের বাইরে দরজার চোখাটের উপরে দুটি বিড়াল বসে বসে আমাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখছিল। টর্চের আলো পরতেই বিড়ালদুটো লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে আমার।হাসতে হাসতে আবারো দরজা বন্ধ করে দিই।এবার আর তালা না লাগিয়ে শুধু ছিটকিনি লাগিয়ে নিজের পালঙ্কে এসে শুয়ে পরি।জখন ঘুম ভাঙ্গে তখন বেলা দশটা।বার থেকে কে যেন জোরে জোরে করাঘাত করছিল।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি শঙ্কর। ভীতিগ্রস্ত চেহারা নিয়ে ও দাড়িয়ে আছে। সাথে কয়েকজন পাহারিয়া লোক। ওরা সম্ভবতঃ আমাকে মৃত ভেবে লাশ নিয়ে যেতে এসেছিল।আমাকে জীবিত এবং হাসতে দেখে ওরা সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়।

শংকরের চেহারা হতাশ হয়ে যায়। যেন আমাকে জীবিত দেখে বেচারা হতাশ হয়েছে।

'সাহেব' আমিতো ভেবেছিলাম আপনাকে ভূতে মেরেই ফেলেছে। অনেকক্ষণ ধরে দরোজা পিটানোর পরেও যখন আপনি দরোজা খুললেননা, তখন গ্রামের লোকজন ডেকে নিয়ে এলাম।' শংকর গ্রামবাসীদের দিকে ইশারা করে বলে।

'ফিরার দরোজা তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।তা তুমি ভিতরে এলে কি করে?'-আমি জিজ্ঞেস করি।

'চাকরদের রাস্তা দিয়ে।' শংকর বলে, চাকরদের জন্য আলাদা রাস্তা আছে।ওটার চাবি আমার কাছে থাকে।'

'তুমি ভালো করে দেখতে পার।' এই দেখো আমি জীবিত আছি।'

রাতে ভূত আসেনি ?' –শংকর অনেকটা অস্তির ভাবে জিজ্ঞেস করে।

ভূততো আসেনি।তবে দুটোবিড়াল এসেছিল।আমি হাসতে হাসতে বলি, সব ঠিক আছে শংকর।

আমি গততিনদিন ধরে পরিশ্রমক্লান্ত এজন্য সকালে উঠতে দেরী হয়ে গেল।এবার তুমি ভূতের কথা মন থেকে মুছে ফেলে নিজের কাজে মনোযোগ দাও।তাড়াতাড়ি নাস্তা সাজাও।'

- 'এক্ষুনি সাজাচ্ছি।' – বলতে বলতে শংকর গ্রামের একজন লোকের দিকে ইশারা করে।লোকটাকে দেখতে অন্যদের চাইতে একটু অভাব-গ্রস্তমনে হলো 'এই হচ্ছে রবিদাস,গ্রামের নম্বরদার।'

শংকর বলে।

রবিদাশ আমার দিকে তাকিয়ে বড় বিনয়ের সাথে হাতজোড় করে।'তার চোখে একরাশ ভয় কাঁপতে থাকে।বলে, 'সাহেব কি পুলিশেরলোক ?'

' না তো'- আমিবলি,'তোমাকে কে বললো?

'কেউনা সাহেব।'- রবিদাস শংকরের দিকে তাকায়।

শংকর বলে,'আপনার কাছে থ্রীনট থ্রীবন্দু ক দেখে ভাবলাম-'

'এরতো লাইসেন্স আছে আমার কাছে।আমি লাইসেন্সধারী শিকারী।'

'সাহেবকি জঙ্গলে শিকার করার জন্য .....

'না' ....আমি হেসে বলি,'এখানে বেদরওয়ারাহর গুহাগুলোতে যেসমস্ত ছবি পাওয়া গেছে তার উপর রঙকরার জন্য এবং ছবি এঁকে নিয়ে যাবার জন্যএসেছি।'

নস্বরদার কথাটা বিশ্বাস করে। বলে, 'তাহলে তো সাহেব অনেক-দিন থাকবেন।'

'হ্যাঁ, যতদিন না কাজ শেষ হয়।'

'সাহেব নিশ্চিত মনে কাজ করে যান।' রবিদাস মাথাটা হঠাৎ ঝুকিয়েব লে,'কোন প্রয়োজন হলে বলবেন, গুলাম হাজির আছে।'

রবিদাসের বলার ধরনটা এমন,যেরকম ব্রিটিশ আমলের নস্বর-দারদের হয়ে থাকে।

'আপাততঃ আমি বেদরওয়ারাহর গুহাগুলো দেখতে চাই।তুমি দেখাতে পারবে ?'

'জী ,আমিতো রয়েছিই।'

'এখন না।ঘন্টা তিনেক পরে এসো।'- আমি কথাটা নস্বরদারকে বললে গ্রামবাসীদের নিয়ে চলে যায় রবিদাস। এবং তিনঘন্টা পরে ফিরে আসার কথা দেয়।

নাস্তা করে শংকরকে সাথে নিয়ে আমি কিল্লার বাকী অংশটা দেখেনিই।আমার কক্ষের সাথে যেকক্ষটার দরোজা বন্ধছিল- ওটা বিচিত্র সব আসবাবপত্রে সজ্জিত।শংকরইআমাকে জানালো।কারণ কক্ষটা খুলে দেখিনি।এরসাথের কক্ষটা ছিল ড্রয়িং রুম।তারপরের অংশ ধ্বসে গেছে।

ফিরে এসে অপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্যান্য কক্ষগুলো দেখলাম । এদিকে ছিলো তিনটে কক্ষ এবং একটি বাথরুম । অবিকল আমার কক্ষটির মতো । কিন্তু বড্ড নোংরা আর অপবিত্র । মনে হলো যেন অনেক বছর ধরে কক্ষটা অব্যবহৃত পড়ে আছে । বারান্দার একদিকে ছিলো এই তিনটি কক্ষ । অপরদিকে অর্ধেকটা দেয়াল ছিলো পাথরের । আর পাথরের এই দেয়ালের উপর বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত রঙীন কাঁচের বেশ কিছু জানালা ছিলোতার উপর সবুজ-, নীল, লাল রঙের কাঁচ শোভা পাচ্ছে । এই সমস্ত কাঁচের জানালা দিয়ে যখন রোদ এসে পড়ে তখন লম্বা হলঘরের মতো বারান্দায় মনে হয় যেন রঙীন কার্পেট ঝলমল করছে । আমি একটা জানালা খুলে

নীচে তাকালে দূরে অনেক দূরে কঙ্কর বিছানো দুর্গম জায়গার কিছুটা অংশ আমার চোখের পড়ে । জায়গাটা গভীর একটা পরিখা । যেখানে এসে বেদরওয়ারাহর দুটো নালা মিলিত হয়েছে ।

অনেক চিন্তাভাবনা করে যে কিল্লাটা তৈরি করা হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায় । এদিক দিয়ে কোন শত্রুপক্ষের আক্রমন করা সম্ভব নয় । আর কিল্লাটার চারিদিক দুটো নদী এমনভাবে ঘিরে রেখেছে । যেন প্রকৃতি আপন নিয়মে একটা কের**** সৃষ্টি করে দিয়েছে ।

এই দুটি নদী কিল্লাটাকে চারদিক থেকে আগলে ধরে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে একটি ছোট টিলার পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার আলাদা হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে । এই টিলার ওপর বিভিন্ন গাছগাছালির ঘন জঙ্গল । সেই জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মন্দিরের পিতলের কলম রোদ চকচক করছিলো ।

"ওই মন্দিরটির নাম ভবানী মন্দির ।"- শংকর বলে ।

শংকর সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলো । সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আমরা একটা বন্ধ দরোজার সামনে এসে দাঁড়াই । শংকর চাবি দিয়ে তালা খুললে ভিতরে আরো একটি সিঁড়ি চোখে পড়ে । ওই সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠে আসি । এখানেও একটি বদ্ধ দরোজা । দরোজাটি খুলে আমরা গোল একটি কক্ষে প্রবেশ করি ।

গোল কক্ষটি নীচের হলঘরটির সমান । পার্থক্য শুধু এই কক্ষটি দেখতে অবিকল ডিমের মতো । আর দেয়ালের গায়ে বিভিন্ন প্রাণীর শিংঅলা মাথার পরিবর্তে পরমার বংশের রাজরাণীর ছবি ঝুলছে । এবং পুরনো ঢালতলোয়ার আর বিভিন্ন-ঐতিহাসিক দ্রব্যসামগ্রী । কাঠের গোল মেঝেতে মূল্যবান ইরানী কার্পেট বিছানো । কার্পেটটি এমন অপরিষ্কার আর ময়লা যে, তার উপরকার বিভিন্ন নকশা এবং রঙ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে যেন ।

শংকর অত্যন্ত গর্বের সাথে বলে, "লাট সাহেব যখন শিকার করতে আসতেন, এই ঘরেই নাচের জলসা বসতো ।"

"আর যখন রাজারা এখানে ছিলেন তখন নিশ্চয়ই গজলের আসর বসতো?"- আমি জিজ্ঞেস করি ।

"তা তো জানি না সাহেব ।"- শংকর বলে ।

এই গোল কক্ষটার চারিদিকে চারটি দরোজা ছিলো । শংকর সব দরোজা খুলে দেয় ।
এবং আমাকে বাইরে নিয়ে যায় । কক্ষটার বাইরে চারদিকেই প্রায় ত্রিশ ফুট চওড়া
মেঝে । তার সামান্য পরেই প্রায় পাঁচ ফুট চওড়া মজবুত এবং পুরু দেয়ালের
প্রান্ত । এবং তা এমন মজবুত যে, এখন পর্যন্ত একটি পাথরও খুলে পড়েনি ।
এই দেয়ালের স্থানে স্থানে অনেকগুলো তোপ সাজানো ছিলো । গুনে দেখলাম প্রায়
আটটা তোপ হবে কিন্তু চারিদিকে এমন সুন্দরভাবে সাজানো যে, কিল্লার
চারপাশের বিরাট এলাকা এই তোপের অধীনে ।
এখান থেকে বেদরওয়ারাহ উপত্যকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পুরোপুরিভাবে চোখে পড়ে ।
উত্তর থেকে দক্ষিন, পূব থেকে পশ্চিমে এই ছোট উপত্যকাটি আমার চোখের সামনে
সম্পূর্ণ উন্মুক্ত । এবং চারিদিকে উঁচু উচুঁ পাহাড়ের সারি । যাদের
চূড়োগুলো বরফে ঢাকা ।
আমি অনেকক্ষন ধরে এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে থাকি । পরে আমার আসল কাজের কথা
মনে পড়তেই ফিরে এলাম । গোল কক্ষ থেকে বেরিয়ে

নীচে আমার কক্ষে চলে আসি। এবং শংকরকে বলি, "দুপুরের খাবারটা এক্ষুনি তৈরী করে ফেল। আমি স্নান সেরে তৈরী হচ্ছি। তারপর বেদরওয়ারাহর জাহাজটা দেখতে যাবো।"

স্নান সেরে কাপড়-চোপড় পরে দুটো টিঠি লিখতে বসে যাই আমি। একটা লিখলাম বাড়ীতে। ভালোয় ভালোয় পৌছতে পেরেছি এই খবরটা জানিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় চিঠিটা লিখলাম আমার অফিসে। এ সময় রবি দাসও এসে পড়ে। চিঠি দুটো তাকে দিয়ে তাগাদা দিলাম যেন আজই কাউকে তিরাহ পাঠিয়ে চিঠি দুটো পোষ্ট করে আসে।

রবি দাস তখুনি একজন যুবক চৌকিদার, বিশ্বেশ্বরকে তিরাহ পাঠিতে দেয়। এবং নিজে লান্চের টিফিন ক্যারিয়ার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আমার সাথে বেদরওয়ারাহ রওয়ানা হয়। একটা কাঠের পুল পেরিয়ে পাথুরে ঢালু পথ দিয়ে আমরা উপত্যাকায় পৌছি। এবং ধানক্ষেত দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলা সরু পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেদরওয়ারাহর
সেই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হই- যেখানে অসংখ্য গুহার অন্ধকারাচ্ছন্ন খোলামুখ হাঁ করে আছে।

ধানক্ষেত পার হয়ে গেলে কৃষকদের ছোট ছোট ঘর চোখে পড়ে। তার থেকে কিছুদুর সামনে এগিয়ে গিয়েই উঁচু মত সমতল জায়গায় গিয়ে পৌছি আমরা। এখানে একটি ফলের বাগান আছে। তারপাশেই একটি কাঠের ব্যাংলোবাড়ী। ঘন গাল-পালার ঘেরা বিভিন্ন ফলের গাছের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা একটি ছোট গেট চোখে পড়ে-

যেটা বাগানের ভেতর চলে গেছে। এবং ভেতরে একটি ছোট কটেজের অংশ চোখে পড়ে। কটেজের পোর্টিকো থেকে গেট
পর্যন্ত একটি ছোট ঢালাই করা রাস্তা ছিল। - যার উপর কালো রঙের হীরক জাতীয় পাথর কেটে কেটে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। গেটের উপর ডানদিকে ছোট একখানি কাঠের সাইনবোর্ড ঝুলছিল। যার একটি পেরেক দিয়ে আটকানো তক্তাটা
আস্তে আস্তে দুলছিল। আমি ঘাড় বাঁকা করে সাইনবোর্ডটার লেখাটা পড়লাম।
"রিচার্ড কটেজ"- সাইনবোর্ডটায় লেখা।

গেটের দু'দিকেই রকমারী ফুলের বাগান। একজন মহিলা মাথা নীচু করে ফুলের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। প্রথমে আমি তাঁকে দেখতে পাইনি। নহরদারের সাথে আলাপ করতে-করতে চলে যাচ্ছিলাম। এই সময় সেই মহিলা- সম্ভবতঃ আমাদের কথাবার্তা শুনে চমকে উঠলেন।এবং পানি দেয়ার ঝাড় হাতে নিয়ে ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর আশ্চর্য হয়ে যেন আমাদের দেখছিলেন। ভদ্রমহিলার গায়ে সাদা সেলোয়ার এবং লম্বা রূপালী চমকের নকশা আঁটা ওড়না। এবং দাঁড়িয়ে আছেন। ওড়নার ফাঁক দিয়ে মহিলার গোল-গোলাপী চেহারায় একরাশ উৎকণ্ঠা ঝড়ে পরে
যেন।

এবং তিনি আশ্চর্যমাখা চোখজোড়া দিয়ে আমাকে নিরীখ করছেন। তিনি আমাকে, আমি তাকে, আমরা একজন অপরজনকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম। তাঁকে পোশাকে-আশাকে, চাল-চলনে, এবং চুল বাধার ধরনে যেন মনে হচ্ছিল শহুরে। এই দম বন্ধ হয়ে যাওয়া জংলী এলাকায় তিনিও একজন শহুরেকে এভাবে তাঁর সামনে দাড়িয়ে থাকতে দেখে
আচম্বিতে হতভম্ভ হয়ে যান।

"সাহেব বেরওয়াহদার গুহাগুলোর ছবি আঁকতে এসেছেন"- নম্বরদার রবি দাস নিজের ভারী পাগড়ী সামলাতে সামলাতে বললেন। পরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে- "ইনি মাহমুদ সাহেবের স্ত্রী। এই বাংলোর মালিক।"
আমি চমকে উঠে লখনভী ঢংয়ে "আদাব" বললাম। ভদ্রমহিলা স্মিত হেসে জবাব
দিলেন। এবং গেট খুলে আমাদের ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ করতে করতে পোর্টিকোর সাথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আলাপের মধ্যেই ভদ্রমহিলা জানালেন, তাঁর নাম নাসিমা। তাঁর স্বামীর নাম
মাহমুদ। ওরা দু'জনে গত বারো বছর থেকে এই কটেজে বসবাস করছেন। তাঁর স্বামী

একজন বিত্তবান লোক, তবে সম্মান-জ্ঞান বড় টনটনে। নিঃসঙ্গতা তাঁর বড় প্রিয়।

তাই তিনি এতো দূরে, কৃষ্টি সভ্যতা থেকে আলাদা বেদরওয়ারাহর এই নির্জন জায়গা পছন্দ করেছেন।

আমি কিছু বলিনি বটে – তবে ভদ্রমহিলা বুঝতে পারেননি, কোন বিত্তশালী লোকের জন্য এই নির্জন বিরান স্থানে আসার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। বিত্তশালীরা তো শহরেও নিজের জন্য একটি বিরান স্থান নির্মান করতে পারেন। যেখানে কেউ যেন মাথা গলাতে না পারে।

পোর্টকোর একটি ইজি চেয়ারের পুরু গদীতে অর্ধেকটা ডুবে থেকে একজন পাতলা লম্বা মতো লোক শুয়ে ছিলেন। ভদ্রলোক চেহারাখানা রুমাল দিয়ে ঢেকে রেখেছে। দেখতে মনে হলো যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আমার অনুমান ভুল। আমাদের পায়ের শব্দ এবং কথাবার্তা শুনে ভদ্রলোক চমকে ওঠেন। মুখের উপর থেকে রুমালটা কোলে এসে পড়ে। আর আমি তাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। ভদ্রলোকের দুটি বাহু এবং চেহারা স্থানে স্থনে ভয়ানক ভাবে পুড়ে গেছে। মনে হচ্ছিলো যেন প্লাস্টিক সার্জারী করে তাঁর চেহারাটা ঠিক করতে গিয়েও ঠিক করতে পারেনি। চোখের পাতা লোমশূন্য। কালো চোখ জোড়া নীচের দিকে ধ্বসে গেছে। একটি চোখ নষ্টও হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে দেখতে এতো ঘৃণা এবং কদাকার দেখাচ্ছিল যে, আমার মনের ঘৃণাভাবটা লুকিয়ে রাখতে পারিনি। তিনি আমার আমার চেহারার এই ঘৃণাভাবটা দেখে ফেলেন। তাঁর চেহারা গভীর দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এবং তিনি কন্ঠে একরাশ অসন্তষ্টি মিশিয়ে স্ত্রীকে বলেন, ‘এ লোক কে ? আর তুমিই বা কেন তাকে এখানে নিয়ে এসেছ ?’

নাসিমা ভয় পেয়ে যান। পরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ততক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিলাম। তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গিয়ে আমি বিশদভাবে নিজের পরিচয় দিলাম। আমার কন্ঠে একরাশ বিনয়ভাব প্রকাশ পেলে ভদ্রলোক যথাসম্ভব প্রভাবিত হলেন মনে হলো। কারণ তাঁর কন্ঠস্বরও তখন অনেক বদলে গেছে। এবং তিনি আমাকে সামনের চেয়ারে বসার জন্য অনুরোধ করেন

আমি চেয়ারখানায় বশে পড়লাম। নাসিমা আমার কাছে দেয়ালের সাথে লাগোয়া একটি আসনে বশে পড়লেন।

‘এবার তুমি বুঝতে পেরেছ।‘ – মাহমুদ আমার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, ‘আমি কেন এই জনমানবহীন বিরান স্থানে বসবাস করছি ? আমার চেহারা আমার ঘরের আগুনে এমনভাবে জ্বলে গেছে যে, অনেক নামকরা প্লাষ্টার সার্জনও হতাশ হয়েছেন। তারা চেহারা একখানা তো বানাইয়ে দিয়েছেন’ – তিনি হেসে বলতে থাকেন, ‘এখন আমি বলতে পারি, এই মুখ, এই কান, এই চোখ, এই নাক। কিন্তু সবকিছু থাকা সত্তেও কিছুই নেই। সব

পুড়ে গেছে।‘ – ভদ্রলোকের হাসিটা বড়ই ভয়ানক। আমি বিড় বিড় করে অসমাপ্ত বাক্য তাঁকে সমবেদনা জানালাম।

‘এসব ফালতু কথা’- মাহমুদ বলতে থাকেন, ‘এই চেহারার প্রতি কারো সমবেদনা জাগে না। আমি নিজেই যেখানে নিজের চেহারাকে ঘৃণা করি- সেখানে তুমি কোথাকে সমবেদনা জানাবে! আমি জানি, তুমি মিথ্যা বলছো।‘

নাসিমা নীরবে আমাকে এমন এক নিরুপায় দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, যেন বলছিলেন, ‘আমার স্বামীকে ক্ষমা করে দাও, যদি তুমি তাঁর মানসিক অশান্তিটা বুঝতে পারো।‘

আমি মাহমুদের কথাগুলো না শুনার ভান করে আরো বিনীরভাবে সমবেদনা জানাতে থাকি। সম্ভবতঃ আমার এই সমবেদনার মধ্যে নিষ্পাপ মানবিকতাও প্রকাশ পাচ্ছিলো। যার দরুন তিনি আবারো নরম হয়ে গেলেন। এবং নাসিমার দিকে বোকার মতো তেরছাভাবে একটি আদৃল তুলে বলেন, ‘এ সমস্ত কিছু নাসিমার দুষ্টুমিতেই হয়েছে। ওর জন্যেই তোমাকে, বেদরওয়ারাহ পাঠানো হয়েছে। তুমি কি টা জানো?’ – মাহমুদ আমাকে জিজ্ঞেস করেন।

আমি ব্যাস্তসমস্ত হয়ে নাসিমাকে দেখতে থাকি। স্বামীর রাগ ভাঙ্গাতে দেখে নাসিমার চোখে-মুখে তখন হাসি দেখা দেয়। বলেন, ‘আমারও ছবি আঁকার শখ আছে-তবে বেশী না.....আমি প্রত্ন-

তাত্ত্বিক বিভাগে বেদরওয়ারাহর গুহাগুলো সম্পর্কে লিখে জানিয়েছি। কিছু কিছু ছবিও এঁকে পাঠিয়েছি। তাদের জানিয়েছি, এই ছবিগুলোর রঙ ফ্যাঁকাসে হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এর একটা বিহিত করা দরকার।‘

‘বেশ কয়েক বছর আমি তাকে অনুমতি দিইনি। মাহমুদের কণ্ঠস্বরে আবারো পূর্বের সেই দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, ‘আমি চাই না কেউ এখানে আসুক। আর যদি আসেও আমি কারো সাথে দেখা করতে আগ্রহী নই। এ কারণেই নাসিমাকে আমি অনুমতি দেইনি। কিন্তু এ বছর ছবিগুলোর দূর্দশা দেখে সে আমার অনুমতি ছাড়াই প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অফিসারকে এখানে আসার আমন্ত্রন জানিয়ে বসে, এবং আমাকে না জানিয়েই চুপে চুপে গুহাগুলো দেখবার ব্যবস্থা করে। যার ফলে কর্তৃপক্ষ তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এবং তুমিও এখানে দীর্ঘদিন থাকবে আর আমার স্ত্রীর সাথে প্রেম করবে।‘

‘মাহমুদ!’- নাসিমা রেগে যান, ‘এসব কি বলছ তুমি?’ – নাসিমার চোখে অশ্রু দেখা দেয়।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। 'আমি দুঃখিত।। সত্যিই আমি জানতাম না। তা না হলে এদিকেই আসতাম না। আমি যাচ্ছি মিঃ মাহমুদ- এবং আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি – আর কখনো আমি এমুখো হবো না।'

'বসো-বসো-আমার কথায় কিছু মনে করো না।'-মাহমুদের চেহারায় কেমন যেন লজ্জিতভাব ফুটে ওঠে, 'আমি এ রকমই – যখন আমাকে ভালো করে জানতে পারবে, তখন আমার কথাগুলো শুনেও না শুনার মতো করে থাকবে। আমার শরীর তো হাড্ডির ফ্রেম হতে চলছে। বেশীদিন আর বাঁচবো না। আমাকে ক্ষমা করে দেয়াই উচিত তোমার। নাসিমা বড় একা। দশ বছর ধরে সে একা রয়ে গেছে আমার সাথে। তার আত্মত্যাগের কোন তুলনাই হয় না। আমি সব বুঝি- কিন্তু.....' বলেই তিনি কাঁদতে থাকেন-চুপচাপ নীরবে।

আর আমি চুপচাপ নীরবে চেয়ারে বসে থাকি। কিই বা বলতে পারি। কেমন যেন অপরিচিত ঠেকে নিজেকে। যে কিনা কোন নাটকের

ঠিক ক্লাইমেক্সে এসে ষ্টেজে ওঠে...। চেয়ার ছেড়ে উঠে পালিয়ে যেতে চাইলাম আমি। কিন্তু পা জোড়া যেন মাটিতে গেড়ে বসেছে আমার।

নাসিমা আমার জন্য চা বানিয়ে নিয়ে এলেন। এবং ওরা স্বামী-স্ত্রী বড় যত্নাত্তি করে চা খাওয়ালেন। পরে আমি চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালে মাহমুদ বলেন, 'নাসিমা তোমার সাথে যাবে। গুহাগুলো ওর দেখা আছে। ও তোমাকে একটা একটা করে ছবিগুলো সম্পর্কে অনেক তথ্য দিতে পারবে।

আমি একটু ইতস্ততঃ করলে মাহমুদ তা গ্রাহ্য করেন না। তিনি নাসিমাকে আমার সঙ্গেই দিলেন।

গেট থেকে বেরিয়ে আমরা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকি। পাহাড়ে ওঠার জন্য নাসিমা বাসন্তী রঙের ব্লাউজ পরে নিয়োছিলো। আর বেগুনী রঙের একখানি রুমাল দিয়ে চুলের উপরটা ডেকে রেখে পেছনের ছচ্ছ চুলগুলোকে বড় একটা ক্লিপের সাহায্যে বেঁধে রেখেছে-যার দরুন তার আনত ঘাড় তীক্ষন দেখাচ্ছিলো। নাসিমার হাতে একটি ছড়ি ছিলো। রবি দাস আমাদের পেছনে সামান্য দূরত্ব রেখে মালপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটছিলো।

'এই উপত্যাকাটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি' আমি বলি, 'এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'দুদিন পর বিরক্তি ধরে যাবে। দড়ি ছিঁড়ে পালাবে। উপত্যকাটার প্রতি আমার ঘৃণা জমে গেছে।'

‘সম্ভবতঃ তোমার জন্যে শহরই ভালো। শহর এবং তার হৈ-চৈ, ক্লাব রেস্তোরাঁ, ডান্স, রকমারী কাপড়ের নতুন নতুন ফ্যাশান, ঝলমল করা ড্রয়িংরুমের মৃদুমন্ধ গুঞ্জন- যে রকম ভদ্র সংস্কৃতিবান লোকদের মধ্যে প্রায় হয়ে থাকে।‘

‘হ্যাঁ’

‘তাহলে তুমি এখানে কেন এসে পড়লে?’

‘কারণ জিজ্ঞেস করছো কেন- সব তো তুমি জেনেই গেছো।‘ -নাসিমা ছোট ছড়িটা দিয়ে নিজের পথের ছোট ছোট পাথরগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছিলো।

‘তুমি পীড়াপীড়ি করলেই দু’জনে শহরে থেকে যেতে পারতে।‘

‘মাহমুদ নিজের চেহারা পৃথিবীর কাউকে দেখাতে পারে না। তুমি জানো না পুড়ে যাবার আগে ও কত সুন্দর আর আকর্ষনীয় ছিলো।‘

‘আগুন লাগে কি ভাবে? কে লাগালো ?’

‘দাঙ্গার সময় লাগে-সাতচল্লিশ সাতলে-গুন্ডারা লাগিয়েছে, তুমিও তো হিন্দু-‘

‘আমার নাম মোতীলাল নাগর’ – আমি বললাম, ‘ যে আমার অতি ঘনিষ্ঠ, নিকটতম হয়ে যায়। সে আমাকে লীলা বলে ডাকে। লাল থেকে লালী।‘

‘আমার সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ হবার কোন সম্ভাবনা নেই নাগরজি’ – সে সিদ্ধান্তসূচক স্বরে বলে, ‘হিন্দুদের আমি ঘৃণা করি।‘-তার কণ্ঠ ক্রোধে জ্বলে উঠে যেন।

‘থ্যাঙ্ক ইউ!’

সে উচ্চস্বরে হেসে দেয়।

‘এটা কি হলো?’ –আমি জিজ্ঞেস করি।

‘I am very capricious’ – সে ইংরেজীতে বলে।

‘সব মেয়েরাই capricious হয়ে থাকে। অর্থাৎ অস্তিরনতি। মুহূর্তে মুহূর্তে তোমাদের সবকিছু বদলাল। তুমিও অপর দুটি মেয়ের চাইতে কোন অংশে আলাদা নও। তোমার আর মাহমুদের বিয়েটা কি কোন প্রেমঘটির ব্যাপার?’

‘না।‘ – ব্যাস এটুকুন বলেই ও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। পরে একটা ছোট পাথরকে নিজের ছড়ি দিয়ে খুব জোরে আঘাত করে বলে, ‘একটা ছেলে ছিলো, আকরাম। সম্ভবতঃ তার সাথেই আমার প্রেম ছিলো।‘

‘তারপর কি হলো?’

সে মাথা নেড়ে বলে, ‘না না, তার সাথে আমার নয়, বরং আমার সাথে তার প্রেম ছিলো। সে আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো এবং তার এই ভালোবাসা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো। তার সাথে আমি খুবই আনন্দে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সে, আকরাম ছিলো বড় গরীব। তার মা-বাবা এবং বংশ মর্যাদাও ছিলো গরীব। তাই তাকে আমি বিয়ে করতে পারি না। কিন্তু সাফ সাফ বলেও দিতে পারি না।‘

'তার প্রতি তোমার দয়া হতো?'
'দয়া নাতার কথাবার্তাগুলা আমার - খুব ভালো লাগত।যে দৃষ্টিতে সে আমায় দেখতো,যেভাবে আমার হাত ধরে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতো,যেরকম বোকার মতো কথা বলতোসত্যিই বড়ই আকর্ষনীয় লাগত তাকে -।তার স্বপ্নগুলো ছিলো বড় অদ্ভুত।রিক্সায় চড়ে তার সাথে যাচ্ছি আমি কোথাও, হয়তো পায়ে হেটে পিকনিকে যাচ্ছি, কোনো পাহাড়ি এলাকার ছোট্ট ঝুপড়িতে আমরা থাকি।আমি গাঁয়ের অন্যান্য মেয়ের মতো তার জন্যে নদী থেকে পানি নিয়ে আসছি,ওর জন্যে রান্নাবান্না করছি,রাতে আধ ভাঙ্গা খাটে খাটে তার মাথা নিজেত বুকের উপর রেখে আস্তে আস্তে হয়তো ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিইত্যাদি-,ইত্যাদি।'
'কিন্তু এতে অদ্ভুতের কি আছে?'
' কেন না এসব স্বপ্ন বড়ই নিচু স্তরের।আমি রিক্সায় কখনো বসিইনি, পায়ে হেঁটে কোনো পিকনিকে যাইনি,কখনো কোনো ঝুপড়িতে থাকিনি।না কোন নদী থেকে পানি তুলে এনেছি,না কখনো রান্নাবান্না করেছি।এমন কি কোন ভাঙ্গা খাটেও শুইনি।বড় অদ্ভুত লোক ছিল সে।সে আমাকে টেনে হেঁচড়ে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চায়।ওর মুখে প্রেমমাখা কথাবার্তা শুনে আমার ভয় করতো।সে কি সত্যিই বড় দুঃখী ছিল?'
'আসল কথা হল'- আমি বলি 'ও বেচারা নিজের দারিদ্রতাটাকে একটা রোমানটিক আবরণে তোমার কাছে পেশ করেছিল।'
' জী'- স্বরটা একটু কড়া করে বলল সে, 'আজকালকার মেয়েরা বোকা নয় যর,এ জাতীয় প্রেমালাপে ধরা দিবে।মুখের এ সমস্ত প্রেমের বুলি দূর থেকে শুনতে বেশ ভালোই লাগে।আমি যখন লক্ষৌর আইকলেজে .টি . একজন কবি -পড়ি, নাম সোয ফতেহপুরী আমার প্রেমে পড়ে যায়। প্রতিমাসে একটিক করে নতুন গজল

'মাসিক মাহতাব' এ আমার জন্যে ছাপাত সে। আর প্রতিটি গজলের কোন না কোন লাইনে আমার নাম থাকতোই। এবং উপরে 'ন' শব্দটি লিখে প্রতিমাসে পত্রিকাটি আমার নামে পাঠিয়ে দিতো।প্রথমবার পত্রিকাটি হাতে পেয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একটা গজল পড়ি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই গজলটা পড়ে। কত সুদূর আর মুল্যবান গজল। কেমন আবেশ জড়ানো। আর শব্দের সুর মূর্ছনায় যেন সঙ্গীত ঝরে পড়ে।'

'ছ'মাস ধরে মাসিক মাহতাবে তার লেখা ছাপা হয়।সব লেখাই আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখে বুজতে পারি।এদিকে গজল পড়ে পড়ে আমার মনটা অস্থির হয়ে উঠে।আমি পাগল হয়ে যায় আমার প্রেমিক কবিকে দেখার জন্যে।কিন্তু তাকে কি করে দেখি?তার ঠিকানা কোথায় পাই?মন চাইছিলো যেখানে যেভাবে পাই না কেন বুকে জড়িয়ে ধরি।একবার ভাবলাম 'মাহতাব' পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখে সোয ফতেহপুরীর ঠিকানা জেনে নিই।কিন্তু একরাশ লজ্জা যেন আমায় ছে 'কে ধরে।আমার সৌভাগ্য এই যে, সপ্তম সংখ্যায় পত্রিকার ভেতরেযেখানে গজল ছাপা - হয়েছেদুপাতার মাঝখানে সোযের একখানা হাতের লেখা চিঠি পেলাম -।'

'সোয সেই চিঠিতে নিজের সব আবেগ অনুভূতি উজার করে দিয়েছে।সে আমার সাথে দেখা করতে চায়।আমিও সেই চিঠি পড়ে আমার প্রেমিক কবিকে দেখার তাগিদা অনুভব করলাম প্রবলভাবে।'

'সপ্তম দিন ছিলো বুধবার।সে দিনটার কথা আমার এখনো মনে আছে।ভালো করে সেজেগুজে কম্পিত হৃদয় নিয়ে বাবার গাড়িটা নিজে ড্রাইভ করে বেনারসী বাগের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।সাঁড়ে ছয়টায় গিয়ে পৌছি।যদি পাঁচটায় পৌছে যেতাম তাহলে বেচারা নিশ্চয়ই হতাশ হতো।কারণ প্রতীক্ষাটা প্রেমিকের জন্মগত অধিকার।যদি তুমি নিজের প্রেমিককে প্রতীক্ষার সুযোগ না দাও,তাহলে সে বড়ই হতাশ হবে।হয়তো প্রেম করায় ছেড়ে দিবে।সেই জন্য সময় দিয়ে সময় মতো না পৌঁছা প্রতিটি প্রেমিকার কর্তব্য।'

এ পর্যন্ত বলেই নাসিমা খিল খিল করে হাসি দেয়। বাইরের উন্মুক্ত পরিবেশে ওর সীমিত আনন্দ যেন এতোদিন প্রাণ ফিরে পায়। এবং এখনও রিচার্ড কটেজের রোগ যন্তনাগ্রস্থ পরিবেশ ভুলেমেয়েদের সেই - সনাতনী হাস্যোজ্জল খোশগল্পে মেতে উঠে।

'তারপর কী হলো?'

নাসিমা তাড়াতাড়ি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে তুমি শোন তো। ..... আমি যখন বকুল গাছের নীচে গাড়ী থামিয়ে দরোজা খুলি, তখন সোম ফতেহপুরীকে দেখি বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তখন তাকে দেখতে এক অদ্ভুদ বিষাক্ত সাপের মত মনে হচ্ছিলো। গাল দুটি বেরিয়ে পড়া, মাথার জোড়া গুলো যেন খুলে পড়ে যাবে অবস্থা। ছোট করে চুল ছাটা। আর পোশাকআশাকের- কথা নাইবা বললাম। সমস্ত আবয়বে তাকে দেখতে এমন মনে হচ্ছিল যেন, চার মাস পর ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করে আজই প্রথমবারের মত সাফ সুতরো হয়ে বেরিয়েছে। তাকে দেখে আমার গা যেন জলে ওঠে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করি -'অাপনি কি সোম ফতেহপুরী?'

জবাবে লোকটি খয়েরী রঙের বত্রিশটা দাঁত বের করে ঝুকে পড়ে আদাব জানায়।

আমি বললাম, 'এক্ষনি আসছি আমি এবং তাকে সামনে এগিয়ে আসার সুযোগ না দিয়ে জোরে গাড়ীর -

দরোজা বন্ধ করে গাড়ী চালিয়ে দিই'।

'এরপর আর তার সাথে কখনো দেখা হয়নি। হতভাগা নাকি নগর শুল্ক অফিসের কেরানী। আর আমার সাথে এসেছে প্রেম করতে .....।'

আমি বললাম, 'আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বাক্য আছে প্রেম দেখে না জাত কুজাত :, প্রেম দেখে না মায়া ! প্রেম তো মনের ছায়া.....।'

'এসব কথা গল্প কাহিনীতেই ভালো শুনায়। নিজের পজিশনের ভেতর থেকেই মানুষের প্রেম করা উচিত।'

'তোমার প্রথম শর্ত ছিলো, মানুষের নিজের ধর্মের ভেতরে থেকেই প্রেম করা উচিত। দ্বিতীয় শর্ত হলো, মানুষের নিজের পজিশনের ভেতরে থেকেই প্রেম করা উচিত। আরো যদি কোন শর্ত থেকে থাকে তাও শুনিয়ে দাও।'

সে হাসে। তবে হাসির সাথে সাথে সে এখন হাঁপিয়েও উঠেছে। কারন চড়াইটা ছিলো খুবই খাড়া এবং - কখনো কখনো আমাদের ঝুকে পড়ে কোন ডালপালার আশ্রয় নিয়ে চড়াই ভাংতে হয়েছে।

এ জন্য আমাদের কথা বার্তা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরই প্রথম - গুহার কাছে এসে পৌঁছি। এবং আমরা তিনজনই গুহাটার ভেতরে ঢুকে পড়ি।

সামনের উপত্যকায় দুটি গুহা । তার বিপরীত দিকে তিনটি । এই পাঁচটি গুহা পাহাড়ের পাথুরে মাটি কেটে কেটে কেউ তৈরি করেনি । গুহাগুলো আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে । পরমার রাজপুতরা প্রথমদিকে এসব গুহার ভেতরে আত্মগোপন করে ছিলো । পরে তারা নিজেদের থাকার জন্যে গুহাগুলো কেটে কেটে বড় এবং প্রশস্থ করে নেয় । মানুষের বাসোপযোগী করে সাজায় । দেয়ালে দেয়ালে বিভিন্ন রকমের ছবি খোদাই করে । এবং পরে অবস্থা একটু অনুকুল দেখে ওরা বাইরে এসে এই কিল্লা তৈরি করে ।

প্রতিটি গুহার মাঝখানে মাটি কেটে কেটে একটি স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে । যার উপর শিব এবং ভবানীর মূর্তি খোদাই করা । পঞ্চম গুহার ভেতরে ছোট মতো একটি পানির ট্যাংক ছিলো । সেই ট্যাঙ্কের ছাদে ফাটল ধরেছে । ফাটল দিয়ে পাহাড়ের উপরের ঝর্নার পানি চুইয়ে চুইয়ে নীচে পড়ছিলো । এবং শিবলিঙ্গকে ধুয়ে ধুয়ে গুহার বাইরে একটি ছোট নালার সৃষ্টি করে ।

পঞ্চম গুহা পর্যন্ত আসতে আসতে ক্ষিধায় পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে আমাদের । এখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই । তাই আমরা গুহার ভেতরের ঝর্নার কাছে গিয়ে বসে পড়লাম । এবং টিফিন কেরিয়ার খুলে খবার খেতে শুরু করলাম । একটি মাত্র রুটির বদলতে মানুষের সাথে মানুষের যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার কোন তুলনাই হয় না । সাধারান একটি বস্তু এই রুটি মানুষকে পরস্পরের অতি নিকটে নিয়ে আসে । তাদের মধ্যবর্তী সব রকমের দূরত্বকে নিমিষে মিটিয়ে দেয় । খেতে খেতে আমার কাছে এই রুটির কয়েকটি গ্রাসকে বড়ই প্রভাবশালী বস্তু বলে মনে হলো ।

‘ এই গুহার ছবিগুলো সম্পর্কে তোমার অভিমত কি ?’ - নাসিমা আমকে জিজ্ঞেস করে ।

‘তোমার কি মত ?’- আমি পাল্টে জিজ্ঞেস করে বসি ।

‘আমার কাছে ভালো লাগে নি । সবগুলো ছবিই আমার কাছে এক রকম মনে হয়েছে । সব মানুষের চেহারা যেন এক ; প্রকৃতি, পরিবেশ যেন এক । মানুষ এবং প্রকৃতি-চেতনা খুব একটা দৃষ্টিগোচর হয় না এসব ছবিতে । এ সমস্ত উপত্যকায় মনোমুগ্ধকর সবুজ শ্যমলতা এবং সুবিস্তীর্ণতা একটা ছবিতেও যথার্থভাবে ফুতে ওঠেনি । মানুষ এবং প্রকৃতিকে একটা বিশেষ উপসর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে । যে রকম সাধারণ আর দশটা ছবিতে দেখা যায় । ছবিগুলোতে অস্পষ্টতা বেশী । এবং এ কারনেই ছবিগুলো দেখে হৃদয়ে একরাশ হতাশার জন্ম নেয় ।’ – এ কথ বলেই নাসিমা চুপ মেরে যায় ।

‘ মনে হয় এই ছবি মানুষের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । পরমার রাজপুতদের নিজেদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে এই অপরিচিত বিজন স্থানে আশ্রয় নিতে হয়েছে বলেই ছবিগুলোতে হতাশা এবং অস্পষ্টতা প্রভাব বিস্তার করে আছে বেশী করে । আমার কাছে তো উপসর্গ গুলো খুবই ভালো লাগছে । এজন্যে যে, মানুষের চেহারার বাহ্যিক গঠনাকৃতির বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ উপসর্গগুলো এক। প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যকে এভাবেই ঔপসর্গিক ঢঙয়ে এখানে পরিবেশন করা হয়েছে । এমন কি মানুষ, পরিবেশ এবং প্রকৃতির একই আভ্যন্তরীণ দুঃখ-বেদনার প্রতিধবনি মনে হয়। পশ্চিমা শিল্পীদের অনেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মেই বাহ্যিক দিকটার প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয় সর্বাধিক । কিন্তু এই গুহার শিল্পকর্ম গুলো আন্তর্মুখী । যেমন স্বয়ং মানুষগুলোই হচ্ছে গুহামুখী - যেখানে শিল্পী নিজের তুলির মাধ্যমে পথ খুঁজে ফিরছে।

‘ছবি গুলো দেখলে আমার দম বন্ধ হয়ে যেতে চায় যেন’ – নাসিমার চেহারায় বিরক্তি প্রকাশ পায়, ‘ছবি গুলো দেখে হাসাও মুশকিল। এই ছবি প্রকৃতির কমনীয়তাকে- মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে এবং যৌবনদীপ্ত কোন মহিলার সুখ- উল্লাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেয় ।’

‘সুখ-উল্লাস আছে কোথায় ? সুখ-উল্লাস তো একটা আলেয়ামাত্র । দুঃখ-বেদনা মানুষের অনন্তকালের ভাগ্য । তার ভবিষ্যৎ নিয়তি । তুমি নিহের ক্ষতিটা দেখ - ’

‘কিন্তু এই বেদনার পরও হৃদয়ের গভীরে কন্দরে লুকিয়ে-থাকা সুখ-উল্লাসের কোন ঝর্ণা থেকে পানি চুইয়ে চুইয়ে বাইরে আসার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে । আমি যুবতী । এবং সুখ-উল্লাসে আমার এই যৌবনদীপ্ত দেহ ফেটে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ছটফট করে । এই কথাটা তুমি বোঝনা কেন ?’ – নাসিমা বড় কষ্ট করে বলে, ‘ হৃদয়েরও একটা নিজস্ব আবয়ব আছে ।’

‘আমি জানি । কিন্তু তবুও আমি বলতে বাধ্য যে, প্রতিটি আবয়বেরও একটা আত্মা থাকে ।’ আমি বলি ।

‘তুমি হতাশাগ্রস্থদের মতো কথা বলছো – তুমি একটা নাম্বর ওয়ান আহম্মক। পৃথিবীর বাইরে আর কিছু নেই । আর আমি ত এই পৃথিবীর একজন এবং এই পৃথিবীর সমস্থ সুখ-উল্লাস আমার চাই – আর তাও ঝুলি ভরে ।’ – নাসিমা বলে ।

‘তাহলে তুমি আকরামকে দিয়ে ঝুলি ভরালে না কেন ?’ – আমি জিজ্ঞস করি ।

‘কারন তার হাথ খালি ছিলো । যখন সে আমাকে ভালোবাসতো, আমি খুব পছন্দ করতাম তাকে । আর আজ আমার কাছে মনে হচ্ছে, হয়তোবা আমি তাকেই জীবনে প্রথম ভালবেসেছি- কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি । তখন তো আমার বাবা-মা আমার সামনে মাহমুদকে এনে হাজির করেছিলো ।’

নসিমা বলতে থাকে, ‘ মাহমুদ সুন্দর, একজন পরিচ্ছন্ন যুবক। একজন বিত্তবান জায়গীদারের সুদর্শন যুবক পুত্র । আমার জীবনের তাবৎ স্বপ্ন সফল করতে পারতো সে এবং সে করেও ছিলো । কিন্তু আমার স্বপ্ন সফল হবার মুহুর্তেও কেন যেন আকরাম বার বার আমার মানসপটে ভেসে উঠতে থাকে । নিঃসঙ্গ মুহুর্তে আমার হৃদয়ে দংশন করতে থাকে । কখনো ফুলের কুঁড়ির মতো সুরভিত করে যেত, কখনো কাঁটার মতো ক্ষত-বিক্ষত করে যেতো । কিন্তু আমার চার পাশে খুশীর এতো ছড়াছড়ি ছিলো যে, আমি আকরামের স্মৃতি অগনিত শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে ফেলেছিলাম । যাতে ভুলেও আমার চোখে না পড়ে ।’

‘মানুষ জার জন্য পাপী হয়, তার সামনে সাধারানত আসতে চায় না’

‘পাপী তো আমি মাহমুদের ব্যাপারেও হয়েছি । এমন দুঃখের দিনেও আমি তার সাথে থাকতে পারছি না । তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছিনা ।’

‘কেন দশ বছর ধরে তুমি নিজের জীবনের সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে, শুখ-উল্লাশ ভুলে গিয়ে দূর জনমানবহীন এই স্থানে পড়ে আছো ? কেন, কিসের মোহে ! নিজের স্বামীর সুখ – দুঃখের ভাগী হবার জন্যে নয় কি ?’

‘মনের দিক দিয়েতো তাকে সঙ্গ দিতে পারছিনা । মনটাকে হত্যাকরে আমি এখানে এসেছি । কিন্তু মন যে মরতে চায়না । টা এই আত্নত্যাগের কি অর্থ – যা কিনা প্রতিটি মুহুর্তে কাঁটার মতো দংশন করে, যা আত্নত্যাগের দেয়ালকে প্রতিটি মুহূর্তে ভেঙ্গে দিয়ে জীবনের যৌবন-পুষ্ট দুটি বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে মনটা মাথা কুটে মরছে । সে আত্নত্যাগ আর আত্নত্যাগ থাকে না । কারাগারের শৃঙ্খলিত জীবন হয়ে যায় । গত দশ বছর ধরে আমি সেই কারাগারের জীবনই যাপন করছি। টা আমি এমন কি পাপ করেছি বলো, যার দরুন অমন শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আমাকে !’ – নাসিমার চোখে অশ্রু দেখা দেয়।

‘তা মাহমুদকে ছেড়ে চলে যাওনা কেন তুমি ?’

একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে ধরে নাসিমা। বলে , ‘ এখন ছেড়ে যাই কি করে বলো ? যার জন্যে দশ দশটি বছর আমার সব সাধ আহ্লাদ জীবন –যৌবন নষ্ট করলাম, তাকে ছেড়ে গিয়েই বা কি লাভ ?’

‘আকরাম কোথায় ?’

‘হবে কোথাইয়ও’ – নাসিমা তিক্ত স্বরে বলে, ‘আজ থেকে বছর তিনেক

আগে – যখন মাহমুদের ক্যান্সার হয়েছিলো, আমি তাকে বোম্বে নিয়ে গিয়েছিলাম টাটা ইন্সিটিউটে চিকিতসা করাবার জন্যে । তখন বোম্বেতে একবার দেখা হয়েছিলো তার সাথে । সে তখন সদ্য ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে । কোন এক ফার্মে পচিশশ’ টাকা মাইনেতে চাকুরী করে ।’

‘ সুখে ছিলো কি ?’ – আমি জিজ্ঞেস করি ।

‘সুখে থাকবে না কেন ?’- সে বলে ।

‘বিয়ে করেছে নিশ্চয়ই ?’- আমি জিজ্ঞেস করি ।

নসিমা বলে ‘ জিজ্ঞেস করার সাহস পাইনি । কিন্তু বিয়ে করবে না কেন ? তাছাড়া অমন ছেলেকে কেই বা কুমার থাকতে দেয় ? এতোদিনে তো ওর ছেলেপিলেও হয়ে গেছে হয়তো ।’

নসিমা একটা মৃদু নিঃশ্বাস গ্রহণ করে । তার আওয়াজে এমন ঘৃনা মিশ্রিত ছিলো যেন তার আক্ষেপ আকরামের ঔরষে তার কেন ছেলেপিলে হলো না। এবং আকরামের ঔরষে অন্য কোন মেয়ের সন্তান জন্ম দেয়ার কোন অদিকারই যেন নেই । মেয়েদের কর্তৃত্ব এবং আত্মসাৎ করার প্রবণতাও একধরনের সৌন্দর্য- যা বড়ই তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে । কারণ প্রেম ভালবাসাটা তাদের কাছে কোন অস্পষ্ট চন্দ্রালোক জাতীয় জিনিষ নয় । তাদের জন্যে প্রেম-ভালবাসাটা এমন একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী আবেগ – যা একজন নারীর হাতের মুঠোয় যে কোন মুহুর্তে আসতে পারে । এবং কোন পুরুষকে সে যখন ইচ্ছে তুলে এনে নিজের বিছানায় ফেলতে পারে । প্রেমের অস্পষ্টতা, আকর্ষণহীনতা এবং অনির্দিষ্টতাকে সে ভয় করে ।

এ জন্যেই মেয়েদের আমি একদম ভালবাসতে পারি না । বিশেষ করে যারা মনে মনে এ জাতীয় একটা পৃথিবী গড়ে তোলে । আমি তো ব্যাস সেই গোলাপী পদ্মচরণকেই ভালবাসি – যা কখনো কখনো স্বপ্নের দিগন্তে নাচতে নাচতে আমার চোখে ধরা দেয় ।

খাবার শেষ করলে রবি দাস এসে জানায়, ‘ সাহেব, এখনো দুটো গুহা বাকী রয়ে গেছে । বেগম সাহেবাও সেগুলো দেখেননি ।’

‘কোথায় ?’ – খুশীর চোটে একেবারে চেঁচিয়ে উঠি আমি ।

‘এই যে এখানে । এই ঘাটির পেছনে ।’ – রবি দাস জঙ্গলে ঘেরা উপত্যকার দিকে ইশারা করে দেখায় ।

নসিমা সেদিকে তাকিয়ে বলে, ‘ ওখান পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে পূর্বদিন লেগে যাবে ।’

আমিও ঘটিটার দিকে তাকিয়ে বলি, ‘দেখতে তো জায়গাটা অনেক কাছে মনে হয় ।’

‘বোকা !’ কোন লৌকিকতার ধার না ধেরেই বলে ফেলে নাসিমা, ‘পাহাড়ী জায়গা এমনিতেই দূর থেকে দেখতে কাছে মনে হয় । কিন্তু যতই নিকটে যাও, ততই দূরে মনে হবে ।’

‘মেয়েদের মতো, তাই না ?’ – আমি জিজ্ঞেস করি ।

সে হেসে দেয় । কিন্তু চেহারা তার লজ্জায় লাল হয়ে যায় ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর উঠে দাঁড়ায় নাসিমা । এবং বলে, ‘আমি তোমাকে সব জায়গা চিনিয়ে দিয়েছি, বলেও দিয়েছি । এবার আমি যাই ।’

‘ আরে বসো । সন্ধ্যায় একসাথে যাবো ।’

‘তুমি কি মনে করো আমারও মন চাইছে না । কত যুগ পরে তো দেশের একজন মানুষের চেহারা দেখতে পেলাম । কিন্তু .....’ বলেই নাসিমা চুপ মেরে যায় ।

‘আচ্ছা যাও – রবি দাস তোমাকে বাংলো পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে ।’

‘আবার দেখা হবে ।’ – বলেই নাসিমা আমার কাছ থেকে বিদায় নেয় ।

রবি দাসকে বলে দিয়েছি, সে যেন বেগম সাহেবাকে বাংলো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসে। ওরা যাবার পর আমি মালপত্রগুলো গুছিয়ে নিই । তারপর গুহার দেয়ালের কাছে গোটা কয়েক চক্কর লাগাই এবং ছবিগুলো গভীরভাবে দেখতে থাকি । শেষে একটি ছবির সামনে নিজের ইজেল ফিট করে নিই- যেটা কাংড়ার বিখ্যাত চিতকর খুশীরামের আঁকা। একটি পাহারী রাজকুমারী নিশুতি রাতে প্রেমিকের সাথে মিলিত হবার জন্যে বরফঝরা ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলো ।

মোটামুটি এই হচ্ছে ছবিটা। ছবি আঁকতে আঁকতে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি যেন এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাই। আমার সামনে না ছিলো কোন গুহা, না অন্য কিছু। ব্যাস, আমার চারদিকে যেন এক ভয়ানক ঝড়ের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যায়। এবং সেই ঝড়ের মধ্যে রাজকুমারীকে নিজের উজ্জ্বল কমনীয় চেহারা নিয়ে প্রেমিককে খুঁজে ফিরছে দেখতে পাই যেন আমি।

সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। এমন সময় রবি দাস এসে বলে, 'সাহেব, ফিরে চলুন। তা না হলে কিল্লা পর্যন্ত পৌঁছতে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

আমি ছবি আঁকার সরঞ্জামাদি গুছিয়ে নিয়ে রবি দাসের হাওলা করে দিই। তারপর দ্রুত পা ফেলে বেদরওয়ারাহ গুহার ঘাট থেকে নামতে শুরু করি। রিচার্ড কটেজে পৌঁছতেই সূর্য ডুবে যায়।

রিচার্ড কটেজের দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিলো নাসিমা। কাঁদতে কাঁদতে চোখজোড়া তার শুকিয়ে গেছে। চেহারা লাল এবং চিবুকের উপর একটা ফোস্কা পড়ে গেছে। রবি দাসকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলে আমি গেটের একপাশে দাঁড়িয়ে যাই। গেটের অপর পাশে নাসিমা। দৃষ্টি তার নীচের দিকে ঝুকানো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে নাসিমা, 'ও নিষেধ করে দিয়েছে, আপনার সাথে আর আমার দেখা হবে না।'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোমার চিবুকে কি হয়েছে?'

'সিগ্রেটের জলন্ত আগুন ছুঁড়ে মেরেছে ০ আমার মুখের ওপর।' – থেমে থেমে বলে সে।

ওর কথা শুনে আমারও মাথাটা নীচের দিকে ঝুকে যায়। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারি না আমি। শেষে নাসিমাকে বলি, 'ও রোগী মানুষ – তাকে ক্ষমা করে দাও।'

'তোমার কি, তুমি বলতে পারো।' – কঠিন স্বরে বলে সে, 'কারণ কেউ তোমাকে এরকম বিজনস্থানের কোন অন্ধকার কুঠুরীতে দশ বছর ধরে বন্দী করে রাখেনি। কিন্তু আমি ঘৃণা করি---ঘৃণা করি---' তীক্ষস্বরে ঘৃণা প্রকাশ করতে করতে বলে নাসিমা এবং মুখ ঘুরিয়ে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে চলে যায়।

সারাপথ নাসিমার ব্যাপারেই ভাবতে থাকি আমি। কখনো সমবেদনা জাগে, কখনো বা ঘৃণা – কেমন আত্মকেন্দ্রিক মেয়ে। স্বামী মৃত্যুর পথে, অথচ সে কিনা কেবল নিজের সুখ-শান্তির চিন্তাতেই বিভোর। কিন্তু না, তেমন খারাপ ও না সে। দশ বছর ধরে এই জঙ্গলের জনবিরল স্থানে পড়ে আছে। অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে চলে যেতো। তা একজন নারীর জীবন এবং যৌবনেরও কিছু দাবী আছে। সেদিকে খেয়াল করলে নাসিমাকে সত্যিই বাহাদুর মেয়েই বলতে হয়। আহা! সে যদি নিজের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা করতে পারতো। কিন্তু সে তো ঘৃণা করে। নিজের প্রতি, স্বামীর প্রতি, সমাজের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা। এমন পরিবেশে পড়লে হয়তো আমিও তাই করতাম।

সারাটা রাস্তা নাসিমার সম্পরকেই ভাবতে থাকি আমি। মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আকাশের কোণে যে এক টুকরা লালিমা জড়িয়ে ছিলো কিল্লার কাছে আসতে আসতে তাও ডুবে যায়। একটা গভীর ধূলোর মেঘ যেন সমস্ত উপত্যকাটাকে নিজের দুটি বাহুর বন্ধনে জড়িয়ে ধরে। কাঠের পুলের কাছে

পৌঁছতেই দেখি একটি লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে শংকর। আমাকে দেখে কিছু না বলেই ঘুরে রাস্তা দেখাতে দেখাতে ফিরে চলে সে।

কিল্লার ভেতরে প্রবেশ করলে আমার কাছে মনে হয় যেন রাতটা বেশ কালো আর অন্ধকার। কিল্লার ভয়ানক রহস্যঘন পরিবেশ মুহূর্তেই আমাকে যেন চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরে। যেন হঠাৎ করেই বাইরের পৃথিবী থেকে আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। আর আমি বুঝি শতাব্দীর অনেক অনেক পুরনো অপরিচিত পরিবেশে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ছি।

রবি দাস কাল সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলে, আমি স্নান করবার জন্য বাথরুমে ঢুকে পড়ি। স্নান সেরে, কাপর-চোপড় বদলে বেরিয়ে এসে দেখি, শংকর দাঁড়িয়ে! বলে, 'খাবার তৈরি।'

খাবার শেষ করে নিজের কক্ষে ফিরে আসি আমি। কিছুক্ষন পর কামকাজ সেরে শংকরও আমার কক্ষে এসে ঢোকে। গতকালের চেয়ে আজ বেশী চিন্তিত দেখায় ওকে। বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি জানি ও কই বলতে চায়। এবং আমি চাই না গতকালের মতো আকজেও আজেবাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাই। সুতরাং ওকে কোন কথা বলার সুযোগ দিতেও আমি নারাজ। তাই অত্যন্ত কঠোরভাবে বলে উঠি, 'চাবিগুলো এখানে রেখে যাও – আর সকালে চলে এসো।'

শংকর বেশ কিছুক্ষন আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর চেহারায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। পরে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি সাহেবের জন্য নীচে ডাকবাংলোর কক্ষ একটা ঠিক করে রেখেছি। সাহেব ওখানে গিয়ে শোবেন।'

'না।' – জোর দিয়ে বললাম আমি, 'আমি এখানে এই কক্ষে, এই কিল্লার ভেতরেই শোব এবং যতদিন বেদরওয়ারাহ থাকবে। এখানেই শোব, যাও – '

আমার কড়া কথা শুনে শংকর বেশ কিছুক্ষন স্তব্ধ হয়ে থাকে। পড়ে হতাশ হয়ে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ঘাড় ঝুকিয়ে বেরিয়ে যায়।

কালকের মতো হলঘরের দরোজা আমি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছি। সমস্ত কক্ষের বন্ধ দরোজাগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। বড় করিডোর দুটোও দেখে নিই। তারপর অনেকটা স্বস্তির সঙ্গে নিজের কক্ষে এসে বসলাম। এবার দেখে নেব ভূত কোথা দিয়ে আসে। থ্রি নট থ্রির উপর হাত বুলাতে বুলাতে ভাবি আমি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় পড়ে থাকি আমি। কিন্তু ঘুম আসে না। এই কিল্লার পরিবেশটাই আসলে ঘুম আসার অনুকূলে নয়। এমন ক্লান্ত হয়ে পরেছি তবুও ঘুম আসে না। কিল্লার ভয়ানক স্তব্ধতা ধীরে ধীরে আমার ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। একটি বিরাটকায় দৈত্যের চেহারা নিয়ে আমাকে যেন ভয় দেখাতে থাকে। মনে হচ্ছিলো যেন কিল্লার একটি দেয়ালের চোখ আছে। এবং চারদিক থেকে সে চোখ আমাকে নিরীখ করছে। আমি মাথা ঝাঁকি দিয়ে ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করি। এবং আমার পুরো মনোযোগ বইয়ের পাতায় ঢেলে দিই। কিন্তু প্রতিটি অক্ষর যেন বিশৃঙ্খল হয়ে ভয়ানক আকার ধারণ করতে থাকে। আমি বই মুড়ে বাতিটা ছোট করে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

কক্ষের আধো-অন্ধকার দেয়ালগুলো যেন এক রহস্যময় ভৌতিকতা নিয়ে আমার বিছানার কাছে এসে নাচতে থাকে। এবং আমি ভয় পেয়ে উঠে বসে পড়ি। লন্ঠনের আলো বড় করে দিয়ে আমার বই পড়তে শুরু করে দেই।

আসলে অর্থহীন এই পড়া। শবগুলো যেন আমার চোখে ঝাপসা ঠেকে, বাক্যগুলো যেন কেমন দুর্বোধ্য। অথচ আমি ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বই নিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু ভয় যেন আমাকে আরো জোরে পেয়ে বসে। পরে ঘুমের ঘোরে চোখ জোড়া জ্বলতে শুরু করলে এক সময় আমি আবারো বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

অন্ধকার-অন্ধকার। যেন অন্ধকারের রাজত্ব এই পৃথিবীতে।

অকস্মাৎ চমকে উঠি আমি। ঘুম ভেঙ্গে যায় আমার – কক্ষে কেউ নেই – লন্ঠনের আলো হাল্কাভাবে ঝলমল করছিলো। দেয়ালের উপর লম্বা লম্বা ছায়া নাচছে। বইটা আমার বুকের উপর খোলা পড়ে ছিলো। বুকটা আমার জোরে জোরে ধুক ধুক করছিলো। এবং মনে হচ্ছিলো যেন কেউ এই মাত্র কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু না – এটা আমার মনের ভুল। কক্ষের দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাথরুমের দরোজা-জানালাও।

যাওয়া-আসার অন্য কোন পথ নেই। আসলে এ কক্ষে কেউ আসেনি। আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলাম।

কিন্তু এর পরও কেন জানি না বার বার আমার মনে হচ্ছিলো যেন কেউ এই মাত্র কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে।

রাতে আর ঘুমুতে পারিনি। সারারাত কোলের উপর বই রেখে পড়ে পড়ে কাটিয়ে দিয়েছি। এভাবে রাতের অন্ধকার হাল্কা হতে হতে এক সময় পুবের আকাশও ফর্সা হয়ে যায়। উঠে দরোজা খুলে দেই। করিডোরের ছোট ছোট জানালাগুলোও। তারপর নীচে নেমে হলঘরের দরোজাটাও। সব দরজা-জানালা খুলে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলে বসে শেভ করতে গিয়ে দেখি, মাথাটা সেই যে ভারী হয়ে আছে কোন রকমেই হাল্কা হচ্ছিলো না।

ইতিমধ্যে শংকরও এলো চা নিয়ে। মুখে কিছু না বললেও তার চিন্তান্বিত চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো যেন সে বেশ অবাক হয়েছে আমাকে জীবিত দেখে। এবং এর কোন অর্থও যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না।

তবে আমার ভ্রুকুঞ্চন দেখে সে কিছু বলার সাহস পায়নি। আর আমিও নিজে থেকে কিছু বলা সঙ্গত মনে করলাম না।

খুব তাড়াতাড়ি স্নান এবং নাস্তাটা সেরে নেই আমি। তারপর রবি দাস আসার আগেই শংকরকে সাথে নিয়ে কিল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ি। আসার একমাত্র উদ্দেশ্য নতুন ডাকবাংলোটা দেখে নেয়া। যদি ওখানে থাকার সুযোগ হয়ে যায়। শংকর মুখে কিছু না বললেও আমার এমন ইচ্ছে প্রকাশে তাকে বেশ খুশী খুশীই দেখায়।

কিল্লা থেকে বেরিয়ে কাঠের পুলটা পেরিয়ে পশ্চিম দিকে শ'খানেক গজ গেলেই ডাকবাংলোটা দেখা যায়। মাঝখানে ছোট একটা মাঠ। হাল ফ্যাসানের ডাকবাংলো হলেও এরকম হাজারো বাংলো যত্রতত্র চোখে পড়ে। বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই এই বাংলোর। এটি সম্পূর্ণ- রূপে পর্যটকদের আরাম আয়েসের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। নতুন নতুন আসবাবপত্রে সুসজ্জিত- যেগুলো ইতিপূর্বেও আমি হাজার বার বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। কেমন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে, অতি পরিচিত আর দশটা বাংলোর মতো দেখতে মনে হচ্ছিলো। নতুন জীবন ব্যবস্থায় এই একরঙা ছবি দেখে মনে হয় যেন প্রতিটি জায়গায় কেমন এক রকমের শূন্যতা বিরাজ করে। জীবন যেখানে এসে আর জীবন থাকে না, এক রকমের ফর্মূলা হয়ে যায়।

ডাকবাংলোর একেবারে কাছেই শংকরের দু' কক্ষ বিশিষ্ট ছোট কটেজ। তবে পাথরের নয়, কাঠের তৈরি। ছাদও কাঠের। যার উপর শুকনো গাছ-গাছালি বিছিয়ে মাটি কেটে বসানো হয়েছে। সেই মাটির উপর এখন ঘাস জমে গেছে। আর সেই ছাদের ঠিক মাঝখানে একটি চিমনী ছিল-যার ভেতর থেকে এখনো হাল্কা হাল্কা ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

নানান ধরনের বৃক্ষকুঞ্জে ঘেরা মন্দিরটির ছবি এখান থেকে দেখতে অনেকটা কাছে মনে হয়।

শংকরের উদ্দেশ্যে বলে উঠি আমি, 'চল, মন্দিরটাও দেখে নেই।'

মন্দিরটি যে টিলার উপর ছিল সে টিলা কিল্লা থেকে নিচু। কিন্তু এরপরও দেখতে বেশ উঁচু মনে হচ্ছিলো। মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে পাথরের তৈরি সিঁড়ি ছিলো। গুণে দেখলাম একানব্বুইটা সিঁড়ি। টিলার চারপাশ দেয়াল এবং বিভিন্ন গাছগাছালিতে ভরপুর। কিন্তু উপরে উঠতে উঠতে লক্ষ্য করি, গাছগাছালিগুলো বিভিন্ন ফলমূলের ভারে যেন নুইয়ে পড়ছে। নাশপাতি, আপেল, আনার এবং থোকা থোকা আঙ্গুর ঝুলছে। জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ফুলের কেয়ারীও ছড়িয়ে আছে। আর আছে বিভিন্ন ফুলকে ঘিরে মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন।

সিঁড়িতে ওঠার সাথে সাথেই মন্দিরের বড়ো দরোজা চোখে পড়ে। যার উপর দেয়াল-ঘেরা একটা চতুর্ভুজ কম্পাউন্ড। দেয়ালের পাশে রকমারী ফুলের কেয়ারী, একদিকে তুলসীর ছোট দোলমঞ্চ একটা, তারপর

দেয়ালের পরেই সবুজ ঘাসের একটা ছোট ঝোপ। এবং এগার থাকের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির উপরই কালো মার্বেল পাথরের একটি মন্দির মাথায় পিতলের মুকুট পরে সকালের প্রথম সোনালী রোদ গায়ে মেখে ঝলমল করছিলো।

আঙ্গিনায় ঢুকে আমি দোলমঞ্চের দিকে না তাকিয়েই মন্দিরের শেষ সিঁড়ির দিকে এগুতে থাকি। পরে শংকরের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্যে পেছন ফিরে তাকাতেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি।

তুলসীর পুরনো দোলমঞ্চের পেছন থেকে দুটি গোলাপি পদ্মচরণ বেরিয়ে আসে। খুবই সুশ্রী এবং পাতলা এক জোড়া পা- ধীরে ধীরে দোলমঞ্চের বাঁ দিকের লম্বা লম্বা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চলতে থাকে। একখানি সাদা শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ডালপালার পেছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে আবার ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে পরিপূর্ণ একটি মেয়ের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসে হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। এবং তাকে দেখে একটা মৃদু চীৎকার বেরিয়ে পড়ে আমার মুখ দিয়ে। রাতে স্বপ্নের ভেতর যে মেয়েটি আমায় কাছে এসেছিলো, এ সেই মেয়ে।

আমি মেয়েটিকে দেখতে থাকি। চমকে উঠে সেও আমাকে দেখে। সেই শ্বেতশুভ্র চেহারায় গোলাপী আভা, গভীর কালো একজোড়া চোখ, উদাসীনতার অথৈ সাগরে ডুবে যাওয়া সিঁথি, খোলা চুল এবং হাতে তুলসী পূজোর থালা। থালার উপর ছোট একটা প্রদীপ- ক্ষীণ আশার মতো টিম টিম করে জ্বলছিলো যেটা।

মেয়েটি একজোড়া চোখের ভারী পাতার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখে। তার চোখে একরাশ বিস্ময় আর অপরিচিতের ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠে। দুটি চোখ ধীরে ধীরে আমার মধ্যে কি যেন খুঁজে ফেরে।

মেয়েটি যেন ডাগর ডাগর কালো একজোড়া চোখের তারার আবেষ্টনীর মধ্যে আমাকে আকর্ষণ করে। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি অনুভব করি আমার চারপাশে সেই কালো এক জোড়া তারা ছাড়া আর কিছুই নেই।

এ সময় হঠাৎ আমার কানে শংকরের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'সাহেব, ও ভবানী মাতার স্বহস্তে গড়া কন্যা।'

আমার বিস্ময় কিছুতেই কমে না। বলি, 'কিন্তু এ তো সেই মেয়েটি- রাতে যে আমার কক্ষে এসেছিলো।'

এ কথা শুনে চমকে উঠে মেয়েটি।

শংকরের চেহারা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। 'কাল রাতে সাহেব বোধ হয় ভূত দেখেছেন।'

'ভূত না, ঠিক ওকেই দেখেছি।

'না, ওকে নয়'- শংকর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'ওর বড় বোনকে দেখেছেন।'

আমি অবাক চোখে মেয়েটিকে দেখতে থাকি।

‘মন্দিরের বাইরে গিয়ে আমি পূরো কাহিনীটা আপনাকে বলবো।‘- আমাকে ক্রমশঃ আশ্চর্য হতে দেখে শংকর বলে।

মেয়েটি ঘুরে যায়। এখন ওর পিঠ দেখা যাচ্ছিলো, আর ওর লম্বা লম্বা ঘন কালো চুল কোমরের নীচ পর্যন্ত ঝুলছিলো। মেয়েটি তুলসী পূজোয় মনোযোগ দেয়। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকি। পূজো শেষ করে ও ফিরে তাকালে আমি এক পা সামনে এগিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, ‘তোমার নাম কি?’

মেয়েটি কিছুই বলে না। পূজোর থালা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকেই দেখতে থাকে।

‘ও কথা বলতে পারে না।‘ শংকর বলে। মেয়েটি নীরবে আস্তে আস্তে মন্দিরের সিঁড়ির শেষ ধাপের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আর আমি সেই গোলাপী দুটি পদ্মচরণকে দেখতে থাকি। যে দুটি পদ্মচরণের অসংখ্য অস্পষ্ট নকশা কতো কতবার আমার মনমস্তিস্কের চারপাশে ঘুরতে দেখেছি। মেয়েটিকে আমি চিনি না। কিন্তু সেই পদ্মচরণ দুটি আমার কতো চেনা।

এ কোন মায়া?

আমার পা জোড়া আপনা থেকেই ধীরে ধীরে মেয়েটির পেছনে পেছনে চলতে থাকে। সিঁড়ি অতিক্রম করে ও খোলা দরোজা দিয়ে মন্দিরের ভেতরে চলে যায়। এবং ভবানী মাতার কালো মূর্তির সামনে মাথা ঝুকিয়ে পূজোয় মগ্ন হয়। আর আমি দরজার বাইরে থেকে তাকে খুঁজে খুঁজে আবার ফিরে আসি।

‘এটা ছেচল্লিশ সালের কাহিনী সাহেব।‘- আমরা দু’জন মন্দিরের টিলা থেকে দূরে নদীর তীরে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে ছিলাম আর শংকর আমাকে বলতে থাকে, ‘পণ্ডিত বরি দাসের একটি ছোট ভাই ছিল। হরি দাস। সে ছিলো এই মন্দিরের পুরোহিত। তার স্ত্রী অনেক আগেই মারা যায়। সন্তানের মধ্যে ছিলো দুটি মেয়ে। বড় মেয়ের নাম শিবন্তী, ছোট মেয়ে রত্না। শিবন্তীর বয়স এতদিনে আঠারো হবার কথা। আর এই মেয়ে বুঝি আত ন’বছরের।‘

‘এরা অনেক পুরনো বংশের লোক সাহেব। পরমার রাজাদের আমল থেকেই নম্বরদারী পদটা ওরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে আসছে। এক ভাই নম্বরদার হলে অপর ভাই হয় পুরোহিত। যদি উত্তরাধিকারী একজন হয় তাহলে সে-ই একসাথে নম্বরদার এবং পুরোহিত। এ মন্দিরের নামে বিশ বিঘে ধানী জমিও আছে। তখনো দেশ ভাগ হয়নি। এদিকে নতুন কালেক্টর জেফারসন সাহেব একদিন শিকার করতে এলেন। সবাই উঠলেন এই কিল্লায়। তখনকার দিনে কিল্লার অবস্থাও ছিলো বেশ ভালো। কালেক্টর সাহেবের সাথে প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজনের মতো ছিলেন আমলা। তারা সঙ্গে করে খাবার সব নিয়ে এসেছিলেন। সারাদিন শিকার করতেন। আর সারারাত করতেন উৎসব। সে এক অদ্ভুত হৈ চৈ ব্যাপার। প্রতিদিন আমি বখশিস পেতাম। বাহাদুর লোক, বখশিস দিতেন বেশ। সাহেব! আজকাল.....’ হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায় শংকর। আমি তার হাতে

পাঁচ টাকার একখানি নোট গুঁজে দিলে চোখে তার অদ্ভুত এক লোভ যেন চক চক করে ওঠে। দুটি হাত জোড় করে আমাকে সালাম জানায় শংকর। এবং নোটখানি পকেটে পুরে আবার বলতে শুরু করে।

‘একদিন জেফারসন বাহাদুর রত্নার বড় বোনকে মন্দিরের বাইরে নদীর তীরে দোলনায় ঝুলতে দেখে ফেলেন। এবং তার প্রতি আসক্ত হয়ে পরেন। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাকে তাঁর কক্ষে ডেকে বললেন, ‘ ওয়েল শংকর বেয়ারা, তোম বহুত আচ্ছা।‘ – বলেই আমাকে দশ টাকার একখানা নোট দেন। আমি সালাম করে নোটটা নিয়ে নেই।‘

‘হাম তোমারা সার্ভিসসে বহুত খোশ হ্যায়।‘- সাহেব বাহাদুর এবার আমাকে ত্রিশ টাকা বখশিস দেন। আর আমি কোমর পর্যন্ত ঝুকে পরে সালাম জানিয়ে টাকাটা নিয়ে নেই।‘

সাহেব বলেন, ‘ হাম ও ছুকরি মাংতা-‘

ভয়ে আমার সারা শরীর কেঁপে ওঠে। কিন্তু কিছুই বললাম না। সাহেব বললেন, ‘হাম ও ছুকরি মাংতা- তোম হামকো লাকে দে সাকটা?’

আমি বললাম, ‘ সরকার – ও মেয়ে শিবন্তী। মন্দিরের পুরোহিতের মেয়ে। গাঁয়ের সবচেয়ে বড় ব্রাহ্মণ এবং সবচেয়ে পুরনো বংশের মেয়ে। ওর গায়ে হাত লাগানো অসম্ভব। তা কখনো হতে পারে না।‘

‘হাম তোমকো পচাস নেহি, শো রূপেয়া দেগা। হাম ও লাড়কি মাংতা।‘

আমি বললাম, ‘ সরকার, পঞ্চাশ কেন পঞ্চাশ হাজার দিলেও আমি তা পারব না। গায়ে গণ্ডগোল বেঁধে যাবে।‘

এ কথা শুনে সাহেব চুপ মেরে যান। চেহারা তাঁর অপমানে লাল হয়ে যায়। কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না। ব্যাস এটুকুই বললেন, ‘ ডিসমিস!’

‘আমি কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি। এরপর আরো তিনদিন থাকলেন সাহেব। শিকার করলেন। কিন্তু আর কোনোদিন তিনি শিবন্তীর নামও উচ্চারণ করেননি। দু’দিন পর তিনি সমস্ত আমলাদের পাঠিয়ে দিলেন। শুধু একটা ঘোড়া আর আর্দালী রাখলেন নিজের কাছে।‘

‘তৃতীয় দিন রাত্রে শিবন্তী মন্দির থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। চতুর্থ দিন ভোরে জেফারসন সাহেব নিজের ঘোড়া আর আর্দালী নিয়ে কিল্লা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এতো ভোরে তিনি চলে গেলেন যে,যাবার সময় কেউ-ই দেখেনি।'

'তুমি কোথায় ছিলে?' - আমি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করি।

'আমাকে সাহেব বাহাদুর নিজের আমলাদের বেয়ারাগিরি করার কাজে তিরাহ পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। তৃতীয় দিন ফিরে এসে জানতে পারলাম, শিবন্তী নিখোঁজ। এবং সাহেব বাহাদুর চলে গেছেন।

দু'দিন পর্যন্ত হরি দাস নিজের মেয়েকে খুঁজতে থাকল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো। সেদিন থেকে এই রত্না বোবা হয়ে যায়। কারো সাথে কথা বলতে পারে না। ব্যাস

শুধু দিনরাত ভবানী মাতার পুজোয় কি যেন ভিক্ষে করে ফিরছে। সে দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছে -।'

'হু,সরকার!'- শঙ্কর বলে, 'গাঁয়ের লোকজনদের হৈ-চৈয়ে একবার হরি দাসের বড়ভাই রবি দাস সাহসে ভর করে আলোকপুর যায়। এবং সরকারের কাছে সব বর্ণনা করে। কিন্তু তখন

দেশ ভাগ হচ্ছে হচ্ছে এমন অবস্থা। আর জেফারসন সাহেব বিলেত চলে যান।'

'কেউ কেউ বলে, জেফারসন সাহেব সাথে করে শিবন্তীকে বিলেত নিয়ে গেছে। এবং সেখানে ও বেশ সুখেই আছে। সায়া পরে। লিপিস্টিক লাগায়। আর ইংরেজীতে ঘট-পট করে-। কিছু কিছু

লোক এও বলে, জেফারসন সাহেব মেয়েটিকে সারারাত কিল্লার ভেতর রেখেছেন। তার সতীত্বহানী করে তাকে মেরে ফেলেছেন। আর লাশটা ঘোড়ায় করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দিয়েছেন।'

'যত মুখ তত কথা।'

'তবে এটা সত্য সাহেব, সেদিন থেকে আর শিবন্তীর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। না সে, না তার লাশ। এখন ওর ভূত এই কিল্লায় যেখানে তার সতীত্বহানী করা হয়েছে, রাতে ঘুরে ফেরে।

এবং কিল্লায় যারা থাকে তাদের ভয় দেখায়।'

'সেদিন থেকে এই কিল্লায় কেউ থাকে না। থাকলেও পরদিন ভেগে ডাকবাংলোয় চলে আসে। আমি নিজে কখনো সাহেব রাতে কিল্লায় শুই না- তা যারাই এখানে আসে তাদের সাবধান করে দিই-

একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার সাবধান বাণী শুনেননি বলে রাতে হার্টফেল করেন। সরকার, শিবন্তীর ভূত বড়ই ভয়ানক। আমি আপনার পা ধরে বলছি- রাতে কিল্লায় থাকবেন না।'

শঙ্কর আমার পা ধরতে লাগলো। আমি পা জোড়া সরিয়ে নিয়ে বললাম,'দেখা যাবে। তুমি নিজের কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ো গে ।'

বড় তীক্ষ্ণস্বরে আমি তার কথা প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ও পাচ্ছিলাম খুব।

সারাদিন গুহায় গুহায় বিভিন্ন ছবির স্কেচ আঁকলাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফেরার পথে রাস্তায় রিচার্ড কটেজের কাঠের গেটটা ভেতর থেকে তালা লাগানো দেখতে পেলাম। রিচার্ড কটেজের ফুলের বাগান

কেমন যেন বিরান। পোর্টিকোতে এখন আর কোন চেয়ার সাজানো নেই। তবে পোর্টিকোতে ভেতরে বন্ধ দরোজার পেছনে আলো ছিল। আলোটা দেখে আমার মনে হল নাসিমার হিংসুক স্বামী নিজের

স্ত্রীকে বসে বসে পাহারা দিচ্ছে। কথাটা ভাবতেই.....মুহূর্তের জন্যে আমার চেহারায় হাসি ফুটে ওঠে। পরমুহূর্তে আবার নাসিমার দুঃখে ভরা জীবনের জন্যে সমবেদনা জাগে। এবং শেষ মুহূর্তে

আমার পা জোড়া কিল্লায় ফিরে যাবার জন্যে সামনের দিকে চলতে শুরু করে। অথচ দিনে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলাম, রাতে কিল্লায় নয়, ডাকবাংলোতেই শোব।

কিন্তু কিল্লা যতই নিকটে আসছিলো, আমার ইচ্ছেও ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছিল। আর কিল্লার ভেতরে পৌঁছানোর সাথে সাথে এক অজানা,অদৃশ্য এবং রহস্যময় শক্তি যেন আমাকে নিজের দুটি বাহুতে

জড়িয়ে ফেলে। যেন এই পরিবেশ থেকে বেরুবার কোন শক্তি আমার নেই। সে এক আশ্চর্য আকর্ষণ, এক অদ্ভুত আকর্ষণ - যা আমাকে নিজের কক্ষের দিকে ডাকছিল। আমি হলঘরে বেশীক্ষণ না

দাঁড়িয়ে সোজা উপরে নিজের কক্ষে চলে যাই।

কক্ষের ভেতরে ঢুকেই দেখি আমার মালপত্র উধাও। শঙ্কর তখন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

'আমার মালপত্র কোথায়?'- আমি রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করি।

'নীচে ডাকবাংলোয় পৌঁছিয়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'সাহেব বলেছিলেন না,রাতে নীচে থাকবেন?'

'না' - আমি বলি, 'আমি এখানেই শোব। মালপত্র নিয়ে এসো।'

'সাহেব!'- শঙ্করের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

'আমি কিছুই শুনতে চাই না- মালপত্র নিয়ে এসো।'

শঙ্কর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার চেহারা দেখতে থাকে। পরে চুপচাপ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে মালপত্র নিয়ে ফিরে আসে। আজ আমি শঙ্করের কাছ থেকে নওকরখানার চাবিও নিয়ে

নিই। যদি এই ভুত বা'র থেকে আসে তাহলে নওকরখানার ভেতর দিয়েও আসতে পারে। এ ছাড়া আমার পাশের কক্ষের চাবিটাও নিয়ে নিলাম। যার অপর একটা দরোজা আমার বাথরুমের সাথে লাগানো।

কেউ সেই কক্ষ দিয়ে বাথরুমে এসে অপর দরোজা দিয়ে আমার কক্ষে ঢুকে পড়তেও পারে। কিছু বলা তো যায়না। এবার আমাকে ভালো করে অনুসন্ধান চালাতে হবে এবং ভূতটার আসল পরিচয় জানতে হবে।

শঙ্কর চলে যাবার পর আমি হলঘরের দরোজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিই। নওকরখানার দরোজায় নিজের হাতে তালা লাগাই। বা'র থেকে আসা-যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে আমি নিজের কক্ষে প্রবেশ করি।

পরে আবার উঠে পাশের কক্ষটা খুলে ভেতর থেকে দেখে নিই। দুটা ছিটকিনিই ভালো করে বন্ধ করে বাইরে এসে শক্ত করে তালা মেরে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসি। তারপর পালঙ্কে বসে বসে সিদ্ধান্ত

নিই - আজ সারারাত আর ঘুমাব না। দেখব এই ভূতটা কোন পথ দিয়ে আসে।

বই টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করি আমি। অনেকক্ষণ - অনেকক্ষণ ধরে বই পড়তে থাকি। ঘুমে চোখ বুজে আস্তে চাইলে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে পানি দিয়ে আসি। তারপর একখানা চেয়ারে বসে সামনে

ইজেল রেখে স্কেচগুলোর উপর রঙ চড়াতে শুরু করি। অনেকক্ষণ পরে চোখে আবারো ঝিমুনী আসে। রঙ যেন স্থানে স্থানে লেপটে যেতে থাকে। অতএব ইজেল থেকে আবারো বিছানায় ফিরে আসি এবং বই

নিয়ে বসি। কিন্তু ঘুমে যেন চোখ ভেঙ্গে আস্তে চায়।

তবুও কোন রকমে চোখের পাতা খুলে রাখার চেষ্টা করি। বার বার ঢুলে ঢুলে পরে যাচ্ছিলাম। পরে আর বলতে পারিনা কখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে শুয়ে আধো

অজ্ঞানতার জগতে চলে যেতে থাকি যেন। সে এক অদ্ভুত জগতে যেন চলে গিয়েছি আমি। না ঘুম, না জাগরণ। এ দু'য়ের মাঝামাঝি কোন এক জগতে আমি যেন পড়ে আছি। মনে হচ্ছিলো যেন শুয়ে আছি।

তার আগে তীব্র একটি সুবাস এসে লাগে আমার নাকে। আমাকে যেন কেমন করে দিয়ে যায়। অনেকটা কর্পূরের সুবাস, কিন্তু খুবই তীব্রভাবে সে সুবাস আমার অনুভূতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট এক জগতে নিয়ে যেতে থাকে। অনেক চেষ্টা করার পরও আমার কাছে মনে হয় যেন চারদিকেই অন্ধকারাচ্ছন্নতা, এক রকমের ছায়া ছায়া অস্পষ্টতা ছড়িয়ে আছে। তবে সেই তীব্র সুবাস ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

আমার কাছে মনে হয় যেন সুবাসটা আমাকে বিছানার সাথে বেঁধে রেখেছে। আমার চোখ খোলা, কিন্তু আমি নড়াচড়া করতে পারছি না। সবকিছুই দেখতে পারছি, কিন্তু নড়তে পারছি না। না ঘুম,

না জাগরণ। সে এক অদ্ভুত রাজ্যে আমি চলে গিয়েছি যেন।

তারপর এই অন্ধকার, অস্পষ্টতার মধ্যে একটি সাদা ছায়া নড়তে থাকে। সাদা শাড়ীতে ঢাকা একটি সতীসাধ্বী উদাস-মাখা চেহারা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। যেন অন্ধকার, অস্পষ্টতার মধ্যে কেউ

পেন্সিল দিয়ে একটি চেহারার স্কেচ তৈরি করছে। দুটি ডাগর ডাগর চোখ আমার একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় । তারপর একটি আওয়াজ, অস্পষ্ট আওয়াজ আমার কানের কাছে বাজতে থাকে। আধখোলা ঠোঁট

জোড়া আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কে তুমি?'

'আমি মোতীলাল নাগর - কিন্তু সবাই লালী বলে ডাকে।'

'লালী।'

'হ্যাঁ,লালী- কিন্তু তুমি কে?'

'আমি শিবন্তী।'

'তুমি কোথা থেকে আস?'

'কোথাও থেকে না - এই কিল্লায় থাকি।'

'এই কিল্লায়,কিন্তু কোথায়?'

'তোমার আশেপাশে।'

'আশেপাশে কোথায়?'

'তোমার অতি নিকটে, তোমার চারপাশে।'

আমি চুপ করে থাকি। এই আধো জাগরণে আমি ভাবতে থাকি,যা কিছু আমি দেখছি, যা কিছু শুনছি তা কি স্বপ্নের ভেতরে না জাগরণের ভেতরে তা পরীক্ষা করা দরকার। আমি হাত তুলে তাকে স্পর্শ করতে

চাইলাম। কিন্তু আমার হাত আপন জায়গাতেই অনড়। এই মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন কোন দূর -দূরান্তের একরাশ ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্টতা থেকে ভেসে আসছে। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। মনে হচ্ছিলো যেন যা কিছু

দেখছি- তার সবই আমার সামনে ঘটছে। আবার এই দেখা আর শোনার ব্যাপারটা আমার চিত্তদৌর্বল্যও হতে পারে। কিম্বা হতে পারে একটা কাল্পনিক সত্য- যার হাত থেকে চেষ্টা করা সত্বেও নিষ্কৃতি

পাচ্ছিনে। কিন্তু- কিন্তু এসব আমি কি বলছি যে, নিজেরই চিত্ত দুর্বলতার আওয়াজ শুনছি! আসলে কি কোন মেয়ে আমার সাথে কথা বলছে?নাকি এটা আমার নিছক বুদ্ধিভ্রম?

'শিবন্তী, তুমি আমার কাছে কেন আস?'

'আমাকে মুক্তি দাও।'

'কার কাছ থেকে?'

'এই কিল্লার চার দেয়াল থেকে। এরা আমাকে বন্দী করে রেখেছে। আমাকে বাইরে নিয়ে যাও- বাইরে নিয়ে যাও-বাইরে নিয়ে যাও।'

বলতে বলতে সে আমার নিকটে, অতি নিকটে আমার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে। সেই ঠোঁট,-সেই মাথা,-সেই নাক,-সেই গভীর কালো টলটলে চোখ আমার একেবারে কাছে এসে যায়। এবং একটা

দীর্ঘ ফোঁপানির শব্দ শুনতে পাই। তারপর যেন ধীরে ধীরে সে আমার অতি নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। হারিয়ে যায় আমার দৃষ্টিসীমা থেকে এবং আমি একটা গাঢ় ঘুমের রাজ্যে ডুবে যেতে থাকি। জানি না...

এতক্ষন এভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন আমার ঘুম ভাঙে, সমস্ত কক্ষ জুড়ে সে এক অদ্ভুত ভৌতিক অন্ধকার বিরাজ করে তখন। লন্ঠনের আলো অনেক আগেই নিভে গেছে। আমি উঠে লন্ঠন জ্বালালাম। তারপর

চারদিকে তাকালাম। সমস্ত কক্ষ, বাথরুম, কিন্তু কোথাও কিছু দেখলাম না। সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ। তবে কক্ষ জুড়ে এক রকমের শুকনো শুকনো কর্পূরের গন্ধ ছড়িয়ে আছে

বেশ কিছুখন ধরে বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে গান্ধটা শুঁকতে থাকি আমি। সত্যিই গন্ধটা বড় অদ্ভুত ধরনের। অনেকটা কর্পূরের মত। তাড়া-তাড়ি দরজা খুলে লন্ঠন নিয়ে বাইরে এলাম আমি। কেউ নেই। পাশের কক্ষটাও তালা লাগানো। তালা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি বাথরুমটাও তালা মারা। দৌড়ে এবার কাঠের বড় করিডোরটায় এলাম আমি। ওখানেও কেউ নেই। নিচের হলরুমের দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ। নওকরখানায়---? ওখানেও আমার আপন হাতে লাগানো তালাটা ঝুলছে। কেউ-ই আসেনি। আসার কোন পথও নেই। তাহলে নিশ্চয় এটা একটা স্বাপ্নিক ব্যপার। কিন্তু জানি না কেন যে এই স্বপ্নটা আমার কাছে বাস্তবের চাইতেও সত্যি মনে হচ্ছে । মনে হচ্ছে যেন সত্যিই শিবন্তী এসেছিল। এসেই চলে গেছে। এবং আমার কক্ষে কর্পূরের সুভাস ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। তার সেই গভীর দুঃখ-বেদনার ভেতরে ডুবে থাকা কন্ঠস্বর এখনও আমার কানে গুঞ্জন তুলছে। আমি স্বপ্নে নয় বাস্তবেই সেই কন্ঠস্বর শুনেছি।

সবদিক থেকে হতাশ হয়েই আমি আবার নিজের কক্ষে ফিরে আসি। ঘড়িতে তখন রাত চারটা বাজে। রাতের শেষ প্রহরে আমি ক্লান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে বালিশে মাথা রাখি। তারপর গভীর ঘুমের রাজ্যে ডুবে যায়।

সকালে ঘুম ভাঙতে সর্বপ্রথম আমি সেই কর্পূরের গন্ধটা শুঁকতে চেষ্টা করি। কিন্তু না, এখন আর সেই গন্ধ নেই। সেই শুঁকনো শুঁকনো কোন এক অদৃশ্য জগত থেকে আসা অদ্ভুত কর্পূরের গন্ধটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভোরে আমেজের সাথে সাথৈ সেই ভোজ-বাজিও মিলিয়ে গেছে।

সারাদিন নিজের কাজ নিয়েই পড়ে থাকি। কিন্তু আজ কাজেও খুব একটা মনও বসেনা। স্কেচে ইঞ্জেল ভরে যাচ্ছিলো বটে, তবে মগজ যেন অপর একজনের স্কেচ তৈরীতেই ব্যস্ত ছিলো। বারবার গুহার দেয়াল গুলো, ছবিগুলো আমার চোখের সামনে কেমন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকে। পরিবর্তে শিবন্তীর বেদনার ভারে আক্রান্ত অনুনয় বিনয় ভরা চেহারা ভাসতে থাকে। আজ দুপরের পর পরই রঙ তুলি আর ইজেল গুটিয়ে রাখি এবং কিল্লায় ফিরে আসার জন্যে পা বাড়াই।

রবি দাস অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি নিশ্চুপ। ফিরার পথে রিচার্ড কটেজের দিকেও ফিরে তাকালাম না। কিল্লা যতই কাছে আসতে থাকে বাইরের পৃথিবী ততই আমার চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। পাহাড়, উপত্যকা, গুহা, গিরিপথ, ধান ক্ষেত, নদীর সঙ্গতমুখর বহুকাবলী, বন বাদাড়ের বুনো গন্ধ , চড়ুই পাখির সুমিষ্ট গান সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। মনে হয় সবকিছু যেন আদৌ বাস্তব নয়। যা কিছু বাস্তব তা এই কিল্লার ভেতরেই রয়েছে। সেই বাস্তব আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সকাল সকাল ফিরতে দেখে শংকর বেশ আশ্চর্য হল। তবে আমার মানসিকতা আগেই জেনে গেছে সে। তাই কিছুই বলে না।

আজ আমি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আহার সেরে নিই। তারপর শংকরকে কিল্লা থেকে বের করে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কারণ, শংকর চলে যাবার পরই কিললাটাকে আমার নিজের, অতি আপন মনে হয়।

কিল্লাটার প্রতি যে আমার একটা অপরিচিত, অজানা ভাব ছিলো তা কেটে গেছে। আর সেই গা ছমছম করা একরকম ভীতিপ্রদ অন্ধকারকেও এখন আর আমি ভয় পাই না। এখন তো কিল্লার সেই অন্ধকারের মধ্যে এক অদ্ভুত আত্নীয়তার টান খুঁজে পাই। যেন আমার প্রতীক্ষায় আছে কেউ। এই হলঘর, বদ্ধ কামরা, সুবিস্তৃত করিডোর, নিঃসঙ্গতা ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কারো পদশব্দ শোনার জন্য যেন প্রতীক্ষারত । আমি ধীরে ধীরে কাঠের করিডোরে, হলঘরের কোণে কোণে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে খুঁজে ফিরি, খুঁজে ফিরি উপরে মুখ তুলে হাওয়ার হাওয়ার, শুঁকতে চেষ্টা করি সেই সুবাস – যে সুবাস কারো পদশব্দের সাথে সাথে সমস্ত কটাক্ষ অন্য এক ভুবনে নিয়ে যায় । কিন্তু কে যেন চুপে চুপে আমার কানে কানে বলে যায়, 'ও এভাবে আসবে না – ও তো এ পৃথিবীরই একজন । যাকে তুমি সম্বর্ধনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে আছো – সে তো সব দরোজা-জানালা বন্ধ দেখে তোমার হৃদয়ের বাতায়ন দিয়ে তোমার অন্তরেই এসে পৌঁছবে । যাও, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার প্রতীক্ষা করো ।'

আমি ফিরে চলি আমার কক্ষের দিকে । অন্ধকার দেয়ালগুলোও যেন পরিহাস করতে করতে আমার পিছু নেয় । অনেকদুর ওরা আমার সাথে থাকে । দু'বাহু বাড়িয়ে আমাকে সাহায্য করে । আমি নিজের কক্ষে ফিরে আসি । এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে শুরু করি ।

বেশ কিছুক্ষন বই পড়তে থাকি আমি । তারপর একসময় বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে । এবং পিট পিট করে গভীর অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে থাকি । ওখানে একরাশ অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না । কল্পনার চোখে প্রবল জোর দিয়ে শিবন্তীর চেহারা অন্ধকারের ফ্রেমের ভেতর ধরে রাখার চেষ্টা করি । কিন্তু অন্ধকার যেন আরো প্রবলভাবে চেপে বসে । বুকের ধুকপুকানি বাড়ার সাথে সাথে কিল্লার নীরব নিস্তব্ধতা আরো দুঃসহ হয়ে বাজে । চিন্তার রাজ্যে কারো মুখচ্ছবি আঁকার প্রচেষ্টা যতই বাড়ে, অন্ধকার ততই বিস্তৃত হতে থাকে । মনে হয় যেন অন্ধকারের অথৈ সাগরে হাত-পা ছুঁড়ে মরছি আমি । কোন কুলকিনারা পাচ্ছি না । এই অন্ধকারের অথৈ সাগরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে আমি বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । আমার অনুভুতি কঠিন

প্রতীক্ষার রাজ্যে জেগে থাকতে থাকতে একসময় হতাশায় ক্লান্ত হয়ে একরাশ বিষন্নতার কোলে ঢলে পড়ে । এবং আমি ডুবে যেতে থাকি অথৈ সাগরে ধীরে ধীরে। তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যেতে যেতে ধীরে ধীরে আমার কানে একটা হাল্কা সুরেরা কণ্ঠসর গুঞ্জন তোলে । যেন কোন এক গানের পাখীর হাল্কা রাগিনী শোনা যেতে থাকে । কোথায় যেন সেই দুটি পদ্মচরণ নাচছে ।

আমার মাথার উপরের শুন্য স্থানটায় ... না ... আমার কক্ষের ছাদের উপর নাচছে । ধীরে ধীরে সেই সোনালী নুপূরের ঝংকার দুটি পদ্ম-চরণের ছন্দ আমার কানে বাজছে । আমার তন্দ্রা কেটে যায় । অনুভূতি প্রখর হয় । মুহূর্তে জেগে উঠি আমি । কানে তখনো সেই হাল্কা সুর যেন গুঞ্জন তুলছে ।

মনে হচ্ছিলো যেন আমার কক্ষের উপরে কেউ নাচছে । কিন্তু আমার কক্ষের উপরে তো আরেকটি কক্ষ, কিল্লার বড় গোল কক্ষ । সেই কক্ষে এই গভীর রাতে কে নাচে ? বোধহয় কোন নর্তকীর আত্মা । সেই রাজকীয় আমলের কোন নর্তকীর আত্মা এখনো সেই গোল কক্ষটার মেঝেতে নাচছে । আর মহারাজ অধিরাজ আপন সভাসদ মোসাহেবদের সাথে সেই নাচ উপভোগ করছেন । কোমরে তাদের খাপবদ্ধ তলোয়ার, চোখে তাদের কামনার দৃষ্টি । এক সময় হঠাৎ নূপুরের ছনছনানি বন্ধ হয়ে যায় । যেন নর্তকী কোথায় চলে গেঝে । নূপুরের ছনছনানি কামরাটা ছেড়ে বাইরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে যেন । কাঠের বড় করিডোরে এসে ঢোকে । সেই পদ্মচরণের নাচের তালে তালে আমার বুকও যেন কাঁপতে থাকে জোরে জোরে । সারা শরীর বেয়ে ঘাম ছুটে দর দর করে । বিছানা ছেড়ে ওঠার চেস্ঠা করছিলাম আমি, কিন্তু আওয়াজটা কাছে, আরো কাছে, অতি নিকটে চলে আসে । তারপর সেই কর্পূরের সুবাস এসে লাগে আমার নাকে এবং তন্দ্রাচ্ছন্নতা আমাকে আরো জোরে চেপে ধরে ।

আমার চোখ খোলা । কিন্তু দেহ যেন ছড়িয়ে আছে চারপাশে । রাতের নিস্তব্ধতাকে চিরে খান খান করে আমার সামনে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে সে । তার সারা শরীর সাদা শাড়ীতে ঢাকা । অন্ধকারে সেই সুন্দর লাবণ্য মাখা চেহারা যেন ঝিলিক দিয়ে যায় । দুটি ডাগর ডাগর মনোহারিণী চোখ যেন অন্ধকারে ভাসছে । রাতের নিস্তব্ধতার সেই দুটি চোখ উদাস এবং বেদনার্ত দুটি চোখ কোন নিঃসঙ্গ ছোট্ট বিলের পানির মত কত পবিত্র । ঠোঁট জোড়া ঈষৎ ফাঁক করে সে –

‘বাবু !’ - বড় করুন স্বরে বলে সে ।

‘লালী বলো ।‘

‘লালী, আমাকে বাঁচাও ।‘ - সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ।‘

‘শিবন্তী, আমার কাছে এসো – আমি তোমার ঠোঁট জোড়ায় আমার আঙ্গুল স্পর্শ করে অনুভব করতে চাই, তুমি সত্যি কোন মানবী কিনা ।‘

‘হ্যাঁ, তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না ?’

‘দেখছি তো, কিন্তু স্পর্শ করতে পারছি না !’

‘স্পর্শ করার চেষ্টাও করে না, - হাওয়ায় মিলিয়ে যাবো ।‘

‘তাহলে তোমাকে বাঁচাবো কি করে আমি ?’

‘তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো বাবু ।‘

‘লালী বলো ।‘

‘লালী, আমাকে বাঁচাও ।‘

‘তোমার কিসের ভয়, কাকে ভয় ?’

‘এই কিল্লার চার দেয়ালে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ।‘

‘তাহলে এই কিল্লার বাইরে চলে যাও ।‘

‘যেতে পারি না ।‘

‘কেন যেতে পারো না – দাও, তোমার হাতটা দাও – এক্ষুনি এই কিল্লার বাইরে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে ।‘

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে । ‘এতো সহজ নয় । দেহ থেকে আত্মা যদি একবার ছুটে যায় তাহলে কি আবার তা এক হয় ?’

‘তাহলে তোমার শাড়ীর একটি আঁচল হলেও ধরতে দাও আমাকে ।‘

‘ওখানে একরাশ অস্পষ্টতা ছাড়া আর কিছুই পাবে না । লালী আমি মরে গেছি ।‘

‘মরে গেলে আমার কাছে কেন আস ?’

‘ঠিক আছে’ – হতাশায় ভরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, ‘কাল থেকে আর তোমার কাছে আসবো না ।‘

ওর চেহারাটা অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে দেখে আমি চিৎকার দিয়ে উঠি, ‘যেও না -, আমি তো এমনি কথাটা বললাম ।‘

চেহারাটা আবারো আমার কাছে ফিরে আসে । লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিস ফিস করে বলে, ‘লালী, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ।‘

‘শিবন্তী, তুমি জীবিত না মৃত ?’

‘দুটোই ।‘

‘এ কিভাবে সম্ভব ?’

‘কেন নয়?’

‘আচ্ছা, বলতো তুমি মারা গেলে কিভাবে – আত্মহত্যা করে, না কেউ তোমাকে মেরে ফেলেছে । নাকি কোন মানসিক আঘাতে হার্টফেল – ‘

চম্পক কলির মত পাতলা লম্বা একটা আংঙ্গুল নিজের ঠোঁট জোড়ার উপর রেখে বলে সে, ‘না, তোমাকে তা বলা যাবে না ।‘

‘আচ্ছা তোমাকে মেরেছে কে তা তো বলবে ?’

ওর হতাশা ভরা একজোড়া ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে ওঠে, ‘বেশি চালাক হবার চেষ্টা করো না । এখন তোমাকে আমার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না ।‘

‘তাহলে কখন বলবে ?’

‘যখন সময় হবে ।‘

‘দাঁড়িয়ে কেন, খাটে এসে বসো ।‘

‘তুমি আমাকে ছুঁয়ে ফেলবে ।‘

‘প্রতিজ্ঞা করছি, ছোঁব না ।‘

সে ধীরে ধীরে নূপুর বাজাতে বাজাতে আমার পালঙ্কের পায়ের কাছে বসে, তবে আমার নাগালের বাইরে -মাঝখানে বেশ ফাঁক রেখে একটু দূরে সরে-।

'প্রতিজ্ঞা করো প্রতিদিন আসবে?'

'প্রতিদিন এসে কি করব?' -ধীরে ধীরে জিগেস করে সে।

'কিছুই করতে হবে না, ব্যাস আমার পাশে বসে থাকবে -আর আমি শুধু চেয়ে চেয়ে তোমাকে দেখবো।'

'দেখে কি করবে?'

'ভালোবাসবো।'

'মৃত্যুর সাথে কে ভালোবাসা করে? আর এই ভালোবাসা থেকে তুমি কিই বা পাবে?' তার কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত হতাশা যেন ঝরে পড়ে।

'তুমি তো জীবিতদের মতো কথা বলছো।'

'তুমি জীবিত বলেই ওভাবে কথা বলতে হচ্ছে।'

'তাহলে কি তুমি চাও আমি মরে যাই?'

'ছিঃ! বাবু অমন কথা বলো না -হতভাগী শিবন্তী মরে গেছে। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার ছিলো, চলে গেছে -তোমার এখনো সময় হয়নি। সময় হলেই তুমি যাবে। কিন্তু তার আগে অনেক কিছুই হবে। তুমি প্রেম করবে, বিয়ে করবে, তোমার ছেলেপিলে হবে, তারপর হাসিখুশীর জীবন অতবাহিত করে তুমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। হতভাগী শিবন্তীর মতো নয়।' -বলেই ধীরে ধীরে কাঁদতে থাকে সে।

আমি তাকে বললাম, 'জানি না কবে থেকে আমি তোমাকে খুঁজছি। এ পৃথিবীর কোন মেয়ের সাথে তো আমার প্রেম হতে পারে না। তাদের আমি ভালোবাসতে পারি না। আমার কল্পনায় দু'টি গোলাপী পদ্মচরণ ঘুরে বেড়ায়। সেদিন তোমাকে আসতে দেখে সেই পদ্মচরণ দুটি চিনতে পেরে আমার হৃদয় খুশীতে নেচে ওঠে। শুনতে রহস্যজনক মনে হলেও কথাটা কিন্তু সত্যি।'

'সত্য হলেও কথাটা কিন্তু বড় মারাত্মক। লালী, আমি মৃত, আর তুমি জীবিত। তোমার পৃথিবী আর আমার পৃথিবীর মাঝখানে যে বিরাট ফাঁক -সে ফাঁক কে পূরণ করতে পারে?'

'আমি লাফ দেবো -তোমার আমার মাঝখানের শত বাধা-বিপত্তি আমি কাটিয়ে উঠবো।'

'না।' -ভয় পেয়ে যায় ও, 'তা কখনো করো না, কখনো না।' -বলেই ও চুপ মেরে যায়। পরে এক সময় অন্ধকারে কান পেতে কি যেন শুনতে থাকে, যেন নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে কোন আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমাকে যেতে হয় -এবার যেতে হয়। সময় হয়ে গেছে, আমাকে ডাকছে।'

'কে ডাকছে তোমাকে?'

কোন জবাব দেয় না সে। ধীরে ধীরে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। আমি বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করলে সে বলে, 'বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করো না।'

আমি তার কথা শুনতে চাইলাম না। সে আমার কাছে থেকে চলে যাচ্ছে, দূরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না আমি। অনেক চেষ্টা করি। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সে হাওয়ায় উড়তে উড়তে আমার কক্ষ ছেড়ে বাথ্রুমে ঢুকে পড়ে। অনেক চেষ্টা করে আমি শেষটায় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। কিন্তু মনে হচ্ছিল আমার মাথার উপর কে যেন একমণ ওজনের পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আর সমস্তটা শরীর থরথর করে কাঁপছে। কোন রকমে বাথরুমের দরোজা পর্যন্ত এলাম আমি। কয়েক মিনিট ধাক্কাধাক্কির পর দরোজা খুললাম।

বাথরুম খালি। সমস্তটা কক্ষে সেই কর্পূরের সুবাস ছড়িয়ে আছে। এবং আমি ওই বাথরুমেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। এরপর আর আমার কিছুই মনে নেই।

সকালে শংকর গ্রামের লোকজনদের সহায়তায় নওকরখানার দরোজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে আমাকে আবিষ্কার করে। প্রথম তো শংকর ধরেই নিয়েছিলো আমি মরে গিয়েছি। কিন্ত পরে তারা বুঝতে পারে আসলে আমি গভীর ঘুমেই পড়ে আছি।

শংকর, রবি দাস এবং গাঁয়ের অন্যান্যরাও আমাকে বেশ বুঝালো, যেন আজ থেকে এই কিল্লায় আর না থাকি। কিন্ত এখন তো শিবন্তী আমার গৃদয়ানুভূতিতে এমন প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, চাইলেও এই কিল্লা থেকে বেরুতে পারবো না। আমার কাছে দিন এখন আর দিন নেই -বিচ্ছেদের একটা দীর্ঘ ক্ষত হয়েই যেন বিরাজ করছে আমার হৃদয়ে। এবং আমার হৃদয়কে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। কখন সন্ধ্যা হবে -রাত নামবে -কখন তাকে দেখতে পাবো -এই চিন্তাতেরি অষ্টপ্রহর কাটে আমার। এই ভূতের রাজ্যে সেই যেন একমাত্র সত্য, বাস্তব। আর এই সোনালী উপত্যকা মূলতঃ স্বপ্ন, অবাস্তব। এই গাছপালা, এই গাঁও-গ্রাম, এই ঘর-বাড়ী, এই মানুষজন, এই গিরি-শৃঙ্গ সবই অবাস্তব, স্বপ্নের মিথ্যা মায়া। আমাকে মিথ্যা মায়ার এই ঝলমল প্রতিচ্ছায়া

অতিক্রম করে বাস্তবতার অন্ধকার রাত পর্যন্ত পৌঁছতে হবে -যেখানে একরাশ কর্পূরের সুবাসের পরিমণ্ডলে আমার শিবন্তী থাকে।

আজ আমার মাথা অসম্ভব রকম ভারী হয়ে আছে। চোখ জ্বালা করছে। আজ আমি শেভ করিনি। স্নান করিনি। কাপড় পাল্টাইনি। দুপুরের খাবারেও তেমন মনোযোগ দিতে পারিনি। রাতে তো খাবার স্পর্শও করিনি।

রাত নামার সাথে সাথে আমার অস্থিরতাও বেড়ে যায়। বার বার ঘড়ি দেখি। এবং অন্ধকার ক্রমশঃ গভীর হবার প্রতীক্ষায় বসে থাকি।

জেগে জেগে সারারাত প্রতীক্ষা করি। কিন্ত শিবন্তী এলো না। চোখ খুলে তাকে ডাকলাম। মনে মনে তাকে স্মরণ করলাম। বিছানায় উপুড় হয়ে শুলাম। এপাশ ওপাশ করলাম। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বন্ধ দরোজা দিয়ে আসতে সময় নষ্ট হবে ভেবে সব দরোজা জানালা খুলে দিলাম। নীচে হলঘরে গেলাম। উপরে সিঁড়ি দিয়ে হাঁটলাম। বড় কাঠের করিডোরে চক্কর লাগালাম। দেয়ালের চারপাশে খুঁজতে খুঁজতে দেয়ালকেই জিজ্ঞেস করলাম- আজ শিবন্তী কেন এলো না?

রাত দুষ্টু ছেলের মতো যেন পালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু আজ শিবন্তী কেন এলো না! কাঠের করিডোরের সমস্ত জানালা খুলে দিয়ে বাইরে মাথা বের করে চারদিকে তাকালাম। দুটো নদীর সঙ্গীতমুখর কলকাকলী শুনতে থাকলাম। আজ তো নদী দুটোও গলা জড়াজড়ি করে যেন কাঁদছে। এবং জোরে জোরে কঁকাচ্ছে। আজ বাতাস সব জানালার কাচের সাথে আঘাত খেয়ে খেয়ে অমন করে কাঁদছে যেন? এরা সবাই কি জানে, আজ শিবন্তী আসবে না? আর আজ যদি না আসে তাহলে আর কোনদিনই হয়তো আসবে না। তাহলে আমি কোথায় কোথায় খুঁজে ফিরবো তাকে। শিবন্তী -তোমার কোন ঠিকানাই তো আমার জানা নেই। তোমার গ্রামও আমি চিনি না। আর আর মেয়েদের তো একটা ঘর হলেও থাকে। ওরা কোন না কোন গ্রামে থাকে। স্নান করার জন্য কোন না কোন পুকুরঘাটে যায়। গলির কোন মোড়ে, চিকন পায়ে চলার পথের কোন প্রান্তে হলেও ওদের দেখা যা। কিন্ত তোমাকে আমি কোথায় খুঁজবো বলো? শিবন্তী -তুমি নিজে যদি আমার কাছে না আস, তাহলে আমার আকাঙ্খারা কি করে তোমাকে কাছে টেনে নেবে!

সে রাত, তারপরের রাত এবং তারওপরের তৃতীয় রাতও এভাবে কাটে। কিতু শিবন্তী আমাকে দেখা দেয় না। আর রাতদিন তাকে দেখার বাসনা আমার হৃদয়ে বাড়তেই থাকে। কিছুই বুঝে আসে না, কি করি! সারাদিন গুহায় ঘুরে ঘুরে কাজ করতে থাকি। আর সারারাত নিদ্রাহীন জেগে জেগে কিল্লা এবং দেয়ালের সাথে

ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরতে থাকি। উঁচু দেয়ালঅলা কাঠের বড় করিডোরে ঘুরে ফিরে জিজ্ঞেস করি- শিবন্তী, তুমি কোথায়? কোথায় শিবন্তী, একবার শুধু এসো, শুধু একবার তোমার প্রিয়দর্শন মুখ দেখাও শিবন্তী।

চতুর্থ দিন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই কাঁপতে থাকি। দাড়ী বড় হয়ে গেছে, চোখ রক্তের মতো লাল, চেহারাও রক্তবর্ণ আর তপ্ত শরীর ভেতরে ভেতরে এক রকমের জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে। গ্রামের লোকজন আমাকে পাগল ভেবে কথাবার্তা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে। রবি দাসও আজ আসেনি। তাতে কি, আজ আমি একাই চলে যাই গুহায়। কিন্ত দুপুরের পর আর কাজ করার সাহসই হলোনা। মাথা ঘুরতে থাকে জোরে, আর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। বড় কষ্ট করে সন্ধ্যার মধ্যেই আমি কিল্লায় ফিরে আসি। এবং বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার অবস্থা দেখে সংকর দুটো পা জড়িয়ে ধরে আমার। এবং কপিতস্বরে বলে, 'সাহেব, জানটা দিচ্ছে। এখনো সময় আছে, আমার কথা শুনুন, নীচে ডাকবাংলোয় চলে যান।'

রাগের চোটে আমি থ্রি-নট-থ্রি টা নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করি। বেচারা শংকর আমার এ অবস্থা দেখে দৌড়ে কিল্লা থেকে পালিয়ে যায়। আমি তাড়াতাড়ি দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিই। তার পর নিজের কক্ষে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। এটুকুই আমি জানি যে, শরীরে আমার প্রবল জ্বর। আর সমস্ত শরীর কোন এক ভেতরগত উত্তেজনায় জ্বলছে। বিছানায় শুয়ে পড়ার পর আমার আর কিছুই মনে নেই। আমি কোথায়, কিভাবে আছি। এবং কতদিনই বা এভাবে পড়ে আছি, আমার কিছুই মনে নেই।

অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু যে মনেও পড়ছিলো না তা নয়। যেমন ঘরের প্রবল উত্তপ্ততার মধ্যে একবার নিজের তপ্ত মাথায় কার যেন ঠান্ডা কর্পূরী আঙ্গুলের মৃদু স্পর্শ অনুভূত হলো। আমি জ্বলে যাওয়া চোখজোড়া খুলে দেহি, তার চেহারা আমার চেহারার উপর ঝুঁকে পড়ে গভীরভাবে কি যেন দেখছে।

ধীরে ধীরে সে আমার মাথায় নিজের আঙ্গুলের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিলো। হতে পারে এটা আম্র ভুল দেখা। জ্বরের ঘোরে ভুল দেখাও স্বাভাবিক। তবে এটা ঠিক ঘরের মধ্যে প্রথম যখন আমি চোখ খুলি তখন শিবন্তীকে আমার চেহারার উপর ঝুঁকে পড়ে থাকতে দেখি। এবং তার চম্পাকলির মতো আঙ্গুলগুলো আমার মাথার চারপাশে সান্তনার প্রলেপ বুলাচ্ছিলো দেখতে পাই।

'শিবন্তী!' -হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সে নিজের ঠোঁটজোড়ায় আঙ্গুল রাখে। যেন আমাকে চুপ থাকার ইশারা করছে।

'কোথায় ছিলে তুমি? এতোদিন আসোনি কেন?'

'স্ স্! তুমি অসুস্থ, কথা বলো না।'

সে আদর করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। আমি তার আঙ্গুলের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। আজ সে নিজে থেকেই আমার পালঙ্কে এসে বসেছে। আমার মাথায় হাত রেখেছে। আমি তার বাহু স্পর্শ করার পরও সে অদৃশ্য হয়ে যায় নি। আগের মতোই আমার বিছানায় বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

শিবন্তী বলে, 'কোথাও না -এখানে তোমার পাশেই তো ছিলাম।'

'পাশে ছিলে? তাহলে দেখতে পাইনি কেন?'

'তুমি আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছিলে যে।'

'কিন্তু এখন তো তুমি নিজেই স্পর্শ করছো।'

'এখন তুমি অসুস্থ -আর বেশী কথা বলা উচিত নয় তোমার।'

'তোমার সাথে কথা বলতে না পারলে আমি মরে যাবো।'

'মরার কথা বলো না। তোমাকে তো অনেক বছর বাঁচতে হবে। মরে গেছি তো আমি।' একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললো সে, 'লালী, একটু ঘুমাও।'

'ঘুমাবো- কতোদিন পর তোমাকে পেলাম। এতোদিন তুমি যদি আমার কাছ থেকে পালিয়ে না বেড়াতে, তাহলে এমন অসুস্থ হতাম না আমি।'

'আর আমি যখন ছিলাম না, তখন কি তুমি বেঁচে ছিলে না?'

'বেঁচে ছিলাম- তোমাকে খোঁজার জন্যে, তোমাকে পাবার জন্যে।'

'আর তুমি আমাকে এমন সময় পেয়েছ, যখন আমি মরে ভূত হয়ে গেছি। আমাকে ভালবাসার চেষ্টা করোনা লালী। আচ্ছা, ছায়ার সাথে কি কেও প্রেম করে ! তোমার আমার মাঝখানে মৃত্যুর এতবড়ো একটা ফাঁক। আমাকে ভালবেসে তুমি কি পাবে ?

' আমি সেই ফাঁকটা লাফমেরে পুরন করব। মৃত্যুর পর তোমাকে পাবার বিশ্বাসটা যদি দৃঢ় হয়, তাহলে মৃত্যু আমার জন্য যত দীর্ঘ পথই হোক, আমি তাঁকে জয় করবই। ' - আমি তাঁর নরম হাতজোড়া নিজের হাতে নিয়ে সেই কর্পূরের সুবাস ছড়ান আঙ্গুলে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকি। ওর বুকজোড়া জোরে জোরে কাঁপতে শুরু করে। চোখ জোড়া গভীর আবেগে যেন বুজে আসে। এ সময় হঠাৎ সে চঞ্চলা হরিণীর মতো

নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়। এবং ভীরু কম্পিত স্বরে বলে, 'তুমি জাননা কত সাবধানে আমি তোমার কাছে আসি। তোমার কাছে আসার জন্য আমাকে কত বড় বিপদের ঝুকি নিতে হয়। আমিতো আসতাম না, কিন্তু তোমাকে অসুস্ত দেখে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না।'

'আমি তোমাকে বুকে তুলে এই কেল্লার বাইরে নিয়ে যাব, তুমি আদেশ করো '- আমি বললাম।

ধীরে ধীরে হাসে সে, 'তাহলে আমি আদেশ করলাম, এখন তুমি শুয়ে পড় এবং চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকো। '

' ঘুমিয়েই যদি পড়ি তাহলে তোমাকে দেখব কি করে ? এতদিন পর তুমি দেখা দিলে-'

'দেখতে পাবে না, তবে অনুভব করতে পারবে। ' – শিবন্তীর স্বরে মৃদু আশ্বাস প্রকাশ পায়, " চোখ বন্ধ করো।" যেন আদেশ করে সে।

আমি চোখ বন্ধ করলে আমার নাসারন্দ্র দিয়ে যেন একরাশ গোলাপজলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। শিবন্তী ঠাণ্ডা পানির সাথে গোলাপজল মিশিয়ে নিজের আচল ছিরে পট্টি বানিয়ে আমার কপালে জলপট্টি দিতে থাকে। আর মৃদুস্বরে একটি গান গুন গুন করে গায়। এখন আর সে গানের সুর আর কথার কিছুই মনে নেই। তবে ছিটে ফোঁটা যা মনে আছে তাতে মনে হলো এতি একটি লোকগীতি।

'রাতে গঙ্গা বহে না

রাত পুরুষ

রাত নারী

দিন ওদের শত্রু

দিন রাতের কাছ থেকে রাতকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়

রাতে গঙ্গা বহে না।

গঙ্গা শুধু দিনে বহে।

রাতে গঙ্গা কালো পোশাক পড়ে বেরোয়-

এবং যেখানে গঙ্গা বহেনা, সেখানে যায়।

জঙ্গলে জঙ্গলে, উপত্যকায় উপত্যকায় এবং মেয়েদের হৃদয়ে যায়।

আর জিজ্ঞেস করে, আমার সতীদান কোথায় ? সাবিত্রী তো শুধু একরাত সতীদান খোঁজার জন্য বেড়িয়েছিল। আর আমি প্রতিরাত ওকে খুজি, আর প্রতিরাত মৃত্যুর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি।

ঘুরে ঘুরে দিনে গঙ্গা হয়ে যাই আর হাওয়ার আঁচল ওড়াতে ওড়াতে বয়ে যাই, কেননা –

দিন যে পুরুষ

এবং রাত প্রেম।

রাতে গঙ্গা বহেনা

শুধু অশ্রু বহে। '

সুরেলা কণ্ঠের ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। এটা শুধু ঘুমপাড়ানি গানই নয়, এটা ছিল ওর আদর সোহাগ, প্রেম, বর্তমানের প্রতি নিবেদন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা – সবকিছু। আমি ওর গানের সুরেলা আওয়াজে ওর কর্পূরী আঙ্গুলের স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ি। ব্যাস, আমার শুধু এটুকুই মনে পড়ে যে ও আমার কপালে বরফজলের পট্টি দিচ্ছিলো। কখনো বা নিজের কোলে আমার মাথা রেখে আদর জানাচ্ছিলো। কখনো গা টিপে দিচ্ছিলো, আমার শুকনো ঠোঁট জোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা পানি দিচ্ছিলো। কখনো বা পথ্যের পেয়ালা নিয়ে আমার শিওরে দাঁড়িয়ে

আছে। এবং চামচে করে ফোঁটায় ফোঁটায় পথ্য মুখে ঢেলে দিচ্ছে। আমার এই দীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে ওকে হাজার হাজার রূপে দেখতে থাকি। হাজার রূপ আর রঙ্গে ও আমার কাছে ধরা দেয়।

একবার আমার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন আমি মরেই যাবো। শিবন্তীর চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু পড়তে দেখে আমি বিড়বিড় করে বলি, 'কাঁদছো কেন, আমি তো তোমার সাথে মিলিত হবার জন্যেই আসছি।'

সে চিৎকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকের সাথে লেপ্টে থাকে। তার ফুলে ফুলে ওঠা দুলে দুলে ওঠা কোমল শরীর কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। হয়তো বা এ সব কিছুই আমার জ্বরের বিকার হতে পারে। কিন্তু সে ক'টি মুহূর্তের স্মৃতি আমার মন থেকে কিভাবে মুছি?

কিছু কিছু স্মৃতি আমার এখনো মনে পড়ে। সে রাতে এক পলকের জন্যে সে আমাকে নিঃসঙ্গ থাকতে দেয়নি। জ্বরের ঘোরে বিড়বিড় করে জেগে উঠলেই তাকে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আছে দেখতে পেতাম। অথবা আমার দেহের সাথে লেপ্টানো দেখতে পেতাম। আবছা আবছাভাবে আমার এও মনে পড়ে, আমি তার কপালে নিজের কপাল ছুঁয়ে আছি, ওর ঠোঁট জোড়ায় চুম্বন এঁকে দিচ্ছি, অস্থিরভাবে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরছি। আর সে, সম্পূর্ণ্রুপেই সে আপাদমস্তক আমার। একান্তই আমার। এ সমস্ত কিছু বিকারও হতে পারে, অথবা অত্যধিক কল্পনার প্রভাব, যা কিছুই হোক, অস্পষ্টভাবে অনেকটা স্বপ্নের মতো এখনো আমার মনে পড়ছে।

যে রকম কোন বাস্তব ঘটনাও মনে পড়ে না, অন্ততঃ এটা আমি বলতে পারি। অন্যেরা এ সবকিছু বিশ্বাস নাও করতে পারে। আসলেও তাই বাস্তবের চাইতে অবাস্তব জিনিস কারই বা মনে থাকে! কল্পনার আবেগ, অনুভূতি সম্পর্কে ক'জনই বা সজাগ থাকে। চোখ তো সবারই আছে, কিন্তু দেখার ক্ষমতা কজনেরই বা আছে।

ব্যাস সে রাতের কয়েকটি টুকরো স্মৃতি আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় রয়ে গেছে। যে অপরিচিত শরীরকে আমি হৃদয়ের সমস্ত কামনা বাসনা দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, যে ঠোঁট জোড়ায় আমার অস্থির ঠোঁট জোড়া স্থাপন করেছিলাম-তার অস্তিত্ব আদৌ ছিলো কিনা কে জানে। আসলে যে মেয়েটির সাথে আমি প্রেম করেছিলাম সে স্বাভাবিক রক্ত-মাংসে গড়া কোন মেয়ে নয়, জনবসতি থেকে অনেক দূরে মৃত্যুর দুয়ারে কোথায় যেন থাকে সে। তার শরীর রাতের অন্ধকার দিয়ে গড়া। কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীর কোন অব্যক্ত আকাংক্ষা দিয়ে গড়া।

কারণ আমার ধারণা, মৃতব্যাক্তি কোথাও যেতে পারেনা-সে ধারে কাছে কোথাও থাকে। স্রেফ জীবিতরাই চলাফেরা করতে পারে, কোথাও চলে যেতে পারে।

আমার আরো মনে পড়ে, আমি তাকে দেখে দেখে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকি। এই ফাঁকে শংকর কি বার কয়েক এসে ঘুরে গেছে? আমার মনে নেই। রবি দাস এসেছিলো কি?

আমার কিছুই মনে নেই-কখন সকাল হয়েছে, কখন রাত হয়েছে-কত দিন, কত মাস, বছর, শতাব্দী, কত হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমার কিছুই মনে নেই।

ব্যাস, মনে আছে শুধু সেই চেহারা-সেই পদযুগল-সে আঙ্গুল-সে চিন্তার রাজ্যে ডুবে যাওয়া, চামেলী ফুলের মতো আপন রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া, শ্বেতশুভ্র চেহারা এবং ফাঁকে ফাঁকে আমার ভুলে যাওয়া অথবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। অথবা জ্বরের প্রভাবে পৃথিবীটা থেকে হারিয়ে যাওয়া-তারপর পৃথিবীটা যেন ছোট হতে হতে কর্পূরের একটি বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তারপর একটি দীর্ঘরাত-আমার চারপাশের সবকিছুকে অস্পষ্টতার রাজ্যে নিয়ে যায়।

আমার জ্ঞান ফিরলে নিজেকে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় আবিষ্কার করি। আমি কিল্লার ভেতরে নই। একটি উজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। এবং আমার শিয়রে একখানি চেয়ারে বসে নাসিমা তখন হাসছিলো।

আমি নতুন ডাকবাংলোয় শুয়ে আছি। শংকর আমার পায়ের কাছে বসে বসে কাঁটা লাউয়ের গুঁড়ো পট্টিতে বেঁধে মালিশ করছে। আমার পায়ে এক অদ্ভুত শীতল অনুভূতি দৌড়ে যায়।

শুয়ে শুয়ে আমি অনুভব করি যেন, কোন এক মরুভূমির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি আমি। সারা শরীর আমার একরাশ তৃষায়, দূর্বলতায় কেমন কাহিল হয়ে পড়েছে। ঠোঁটজোড়া কেমন শুকনা। কণ্ঠনালীর ছাল উঠে গেছে যেন।

আমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে নাসিমা হেসে ওঠে। 'শুকরিয়া আদায় করো তুমি যে বেঁচে গেছো। তা না হলে কিল্লার ভূত তোমার ঘাড় মটকে খেতো। চেষ্টা কিছু কম করেনি।'

'তুমি কখন এলে এখানে?'- আমার কথা তখনো শেষ হয়নি।

'বেগম সাহেবা তিনদিন থেকে এখানে'- শংকর পা মালিশ করতে করতে বলে, 'তিনিই আপনাকে কিল্লা থেকে উদ্ধার করে এই ডাকবাংলোয় এনে তুলেছেন।'

'কেন ?'- আমি জিজ্ঞেস করি।

'তা না করে কি শিবন্তীর প্রেতাত্মার হাতে মরে যেতে দেবো তোমাকে?'- নাসিমা জিজ্ঞেস করে। পরে শংকরের প্রতি ইশারা করে বলে, 'তোমার এই পাহাড়ী বেয়ারা বড়ই বোকা। ক'দিন থেকে তুমি জ্বরে বেহুঁশ হেয়ে পড়ে আছো, অথচ তার সাহস হলো না তোমাকে কিল্লা থেকে তুলে নিয়ে আসে। বলে, সাহেব রাগ করেন। আরে সাহেব বাঁচলে তো রাগ করবেন। এখানে তো এই প্রেতাত্মার হাতে তার জীবনটাই যাবে।'

'প্রেতাত্মা' শব্দটা শুনার সাথে সাথে আমার চেহারার রঙ পরিবর্তন দেখে নাসিমা জ্বলে ওঠে। বলে, 'কথাটা তোমার কাছে ভালো লাগছে না, তাই না? তোমাকে মরে যেতে দিলে বোধহয় ভালো হতো!'

আমি শুয়ে শুয়ে উপেক্ষার দৃষ্টিতে হাসতে চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যর্থ হই।

নাসিমা হাতঘড়ি দেখে শংকরকে বলে, 'সময় হয়ে গেছে, সাহেবের জন্য সুপ নিয়ে এসো।'

শংকর চলে গেলে নাসিমা আমার আরো কাছে ঘেঁষে বসে। এবং বলে, 'রবি দাস যদি সময় মতো খবরটা না দিতো তাহলে এতোক্ষণে তুমি শেষ হয়ে যেতে। তার উপর আবার আমার স্বামীরও দয়া হলো তোমার উপর। অথচ এ রকম সাধারণত হয় না। সে আমাকে পাঠিয়ে দিলো তোমার নার্সিংয়ের জন্যে। এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে কি কিছু পাওয়া যায়, তবুও শোকর যে, আমাদের কাছে সব সময় ওষুধের ষ্টক পড়ে থাকে। প্রতি দু'তিন মাস অন্তর অন্তর আমরা আলোকপুর থেকে অষুধপত্র এনে ষ্টক করে রাখি। গত তিনদিন থেকে আমি এখানে, এই কক্ষেই পড়ে আছি।'

কক্ষের এক কোণে নাসিমার বিছানাও পাতা ছিলো। আমি সেদিকে তাকালাম।

'তুমি আমাকে জানে বাঁচিয়েছো।'- আমি থেমে থেমে বললাম।

আমাকে হাত জোড় করতে দেখে নাসিমা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে- 'হাত জোড় করো না তো, তোমাদেও হিন্দুদের এই আচরণটা আমি বড্ড অপছন্দ করি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বার বার শুধু হাত জোড় করতে থাকো।'- বলেই নাসিমা জোরে হেসে ওঠে। তার কণ্ঠস্বর একেবারে বদলে যায়। বলে, 'এই মৃত মেয়েটি ছাড়া পৃথিবীতে কি ভালোবাসার জন্যে আর কোন মেয়েই পেলে না তুমি! আর মৃত তো মৃত, এমন মৃত- হাড় পর্যন্ত মাটির সাথে মিশে গেছে।'

'তুমি কি করে জান ?' - মৃদুস্বরে জিজ্ঞাস করি আমি।

'আরে আমি কি, গাঁ-শুদ্ধ লোকে জানে। তখন তুমি জ্বরের ঘোরে কিল্লার ভিতরে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিলে এবং শিবন্তী বলে কিল্লার দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকে মরছিলে। পরে যখন আমি তোমাকে

এখানে নিয়ে আসি, তখনো তুমি অজ্ঞান অবস্থায় শিবন্তী... শিবন্তী... করছিলে। গত তিন দিন ধরে তো এই নামটা শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। যদি কোন জীবিত মেয়ের জন্যে এভাবে চিৎকার দিয়ে মরতে তাহলে দুঃখ পেতাম না আমি। কিন্তু তাও একটা মৃত মেয়ের জন্যে, লাহাওলা ওলা... তওবাঃ তওবাঃ...'

সন্ধ্যার দিকে নাসিমা চলে যায়। যাওয়ার আগে বলে যায়, 'আজ থেকে তুমি আর ঐ কিল্লায় রাতে কখনো যেতে পারবে না। তা'না হলে আমি তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখে দেবো। আমি তোমার সমস্ত কাগজপত্র দেখে ফেলেছি। তোমার দাদা তো আমার বাবার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। যদিও তিনি হিন্দু। যাক, আসল কথা হলো এবার থেকে তোমার সব দায়িত্ব আমার উপর। তুমি নিতান্তই সৌন্দর্যের ফিলসফিতে ডুবে থাকা বোকা এবং ফালতু আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী যুবক। এ জন্যে তোমার উপর কড়া দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে

পড়েছে। যদি তুমি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কিম্বা ভালো হবার পরও পুনরায় ঐ কিল্লায় পা রাখো তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার বাবার কাছে খবর পাঠাবো। আলোকপুর থেকে তার করে দিলে তিনি সাথে সাথেই চলে আসবেন। এবং তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমি জানি তুমি তার একমাত্র ছেলে। এ জন্যে অস্বীকারও করতে পারবেন না।'

তারপর শংকরকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'সাহেব কিল্লার দিকে যাবার চেষ্টা করলেই আমাকে জানাবে। যাক, অন্ততঃ আগামী দু'তিন দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। তবুও যদি যেতে চায়, তাহলে রশি দিয়ে পালঙ্কের সাথে বেঁধে রাখবে। এটা আমার আদেশ, বুঝলে?'

'জী' –শংকর হাত জোড় করে বলে।

'আমি যাচ্ছি' –নাসিমা আমাকে বলে, 'তিন দিন ঘরে যাই না। এবার ওদিককার খবরটা তো নিই। আমার ভাগ্যে শুধু খবরদারী আর খবরদারী!' নাসিমার কণ্ঠে কৃত্রিম উষ্ণতা প্রকাশ পায়। আমার দিকে শেষবারের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যায় নাসিমা।

পরদিন ঘুম থেকে জেগে দেখি, ফুলদানীতে লম্বা লম্বা ডাঁটা-অলা একগুচ্ছ নার্গিস ফুল সাজিয়ে রাখছে শংকর। ফুলগুলো দেখে আমার হঠাৎ শিবন্তীর চোখের কথা মনে পড়ে যায়। এবং হৃদয়টা দারুণভাবে কাঁপতে শুরু করে। শংকরকে জিজ্ঞেস করি, 'এই ফুল কি তুমি এনেছো?'

মাথা নেড়ে অস্বীকার করে শংকর। বলে, 'রত্না এনেছে।'

'রত্না কে?'

'শিবন্তীর বোন।'

এবার রত্নার কথা মনে পড়ে আমার। দেখতে অবিকল শিবন্তীর মতো সে।

'তা ভেতরে এলো না কেন রত্না?'

'সে তো কারো সাথে কথা বলে না। বড় লাজুক।'

'কথা বলে না কেন?'

'এমনি বোধ হয়।–সেই দুর্ঘটনার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে। ভয় ঢুকে গেছে হয়তো অর মনে।'- শংকর অনেক ভেবে-চিন্তে বলে, 'তখন বেচারীর বয়স বড়জোর আট কি'ন'। এখন তো আর কথাই বলতে পারে না। কারো সাথে মেলামেশাও করে না। ব্যাস, সবসময় পূঁজো অর্চনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।'

ফুলগুলো ভালো করে সাজিয়ে আমার কাছে তেপায়ার উপর রেখে দেয় শংকর। আর আমার মনে হচ্ছিলো হাজার হাজার চোখ দিয়ে শিবন্তী আমাকে তাকিয়ে দেখছে।

‘ফুলদানীটা বাইরে নিয়ে যাও।’

অবাক চোখে আমাকে দেখতে থাকে শংকর।

‘এই ফুল আমার ভালো লাগে না।’

ফুলদানীটা বের করে নিয়ে যায় শংকর।

কিন্তু পরদিন ফুলদানীতে সেই একই ফুল সাজানো।

‘আবার কোত্থেকে এলো এই ফুল?’

‘সেই রত্নাই দিয়ে গেলো। আপনাকে দেয়ার জন্যে ইশারা করে বললো।’

এখানে নয়িে আস,ি তখনো তুমি অজ্ঞান অবস্থায় শবিন্তী... শবিন্তী... করছলি।ে গত তনি দনি ধরে তো এই নামটা শুনতে শুনতে আমি বরিক্ত হয়ে গছে।ি যদি কোন জীবতি ময়েরে জন্যে এভাবে চৎিকার দয়িে মরতে তাহলে দুঃখ পতোম না আম।ি কন্তি তাও একটা মৃত ময়েরে জন্য,ে লাহাওলা ওলা... তওবাঃ তওবাঃ...’

সন্ধ্যার দকিে নাসমিা চলে যায়। যাওয়ার আগে বলে যায়, ‘আজ থকেে তুমি আর ঐ কল্লিায় রাতে কখনো যতেে পারবে না। তা’না হলে আমি তোমার বাবার কাছে চঠিি লখিে দবেো। আমি তোমার সমস্ত কাগজপত্র দখেে ফলেছে।ি তোমার দাদা তো আমার বাবার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছলিনে। যদওি তনিি হন্দিু। যাক, আসল কথা হলো এবার থকেে তোমার সব দায়ত্বি আমার উপর। তুমি নতিান্তই সৌন্দর্যরে ফলিসফতিে ডুবে থাকা বোকা এবং ফালতু আধ্যাত্মকিতায় বশ্বিাসী যুবক। এ জন্যে তোমার উপর কড়া দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।ে যদি তুমি এই অসুস্থ শরীর নয়িে কম্বিা ভালো হবার পরও পুনরায় ঐ কল্লিায় পা রাখো তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার বাবার কাছে খবর পাঠাবো। আলোকপুর থকেে তার করে দলিে তনিি সাথে সাথইে চলে আসবনে। এবং তোমাকে নয়িে যাবনে। আমি জানি তুমি তার একমাত্র ছলে।ে এ জন্যে অস্বীকারও করতে পারবনে না।’

তারপর শংকরকে উদ্দশ্যে করে বললো, 'সাহবে কল্লির দকিে যাবার চষ্টো করলইে আমাকে জানাব।ে যাক, অন্ততঃ আগামী দু'তনি দনি বছিানা ছড়েে উঠতে পারবে না। তবুও যদি যতেে চায়, তাহলে রশি দয়িে পালঙ্করে সাথে বঁেধে রাখব।ে এটা আমার আদশে, বুঝল?ে'

'জী' –শংকর হাত জোড় করে বল।ে'ওকে বলে দিলে না কেন এই ফূল আমার পছন্দ নয়!'

'বলেছিলাম'—শংকর বলে, 'কিন্তু ইশারায় আমাকে জানালো, সাহেব পছন্দ না করলে কি হবে, আমি তো করি।'

অদ্ভুত পাগল মেয়ে। নাসিমাকে কথাটা জানালে সে বলে, ' বোনের এই ভয়ানক দুর্ঘটনার পর মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমার তো মনে হয় সে পাগল হয়ে গেছে। মেয়েমানুষ দেখলেই সে পথ পরিবর্তন করে ভিন্ন পথ ধরে। পুরুষদের কাছ থেকেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। পারলে পৃথিবী থেকেও আলাদা হয়ে থাকে। যাক, এই মন্দিরের নামে বিশ-পঁচিশ বিঘা জমি আছে, ওর জীবনটা কোন রকমে কেটে যাবে।'

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকি আমি। নাসিমা এখন প্রতিদিন আসে। এবং দিনের অধিকাংশ সময় আমার সাথেই কাটায়। বড্ড বেশী কথা বলে। অন্যান্য মেয়েদের মতো বেশ প্র্যাকটিক্যালও। নার্সিংটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। ওর কথার বাইরে একটা কাজ করারও জো নেই আমার। তবে মানতেই হবে, কাজ সে জানে। সময়মতো যদি সে আমার দেখাশুনা না করতো তাহলে আমার অবস্থা যে কি হতো!

'আমার কাছে নয়, আমার স্বামীর কাছে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ওর অনুমতি ছাড়া এখানে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।'

'যখন চলাফেরা করতে পারবো, সবার আগে মাহমুদের কাছেই যাবো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। আছে কেমন ও?'

'আগের মতোই। রোগ বেড়ে গেলে মেজাজও খারাপ হয়ে যায়।'

'আকরামের কোন খবর পাওয়া গেছে?'

নাসিমা চমকে উঠে আমার দিকে তাকায়। বেশ কিছুক্ষণ আমাকে নিরীখ করে। পরে বলে 'তুমি কি করে জানলে?'

'কি?'

'আমি তো এখনো মাহমুদকেও জানাইনি, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

‘কি জানলাম?’

‘এই আকরামের ব্যাপারটা?’

‘আমি তো কিছুই জানি না— এমনি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।’

এদিক ওদিক তাকায় নাসিমা। বুঝে নেয় আমি একা। তারপর অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ফিস ফিস করে রহস্যজনকভাবে বলেত, ‘আকরামের বেশ ক’টা চিঠি এসেছে আমার কাছে। জানি না কিভাবে আমার ঠিকানা যোগাড় করেছে। আমাকে এখনো ভালোবাসে সে। এখনো বিয়ে পর্যন্ত করেনি।

নাসিমার কণ্ঠস্বরে মেয়েলী অহঙ্কার এবং বিজয়ের হঠাৎ ঝলক প্রকাশ পায়।

‘মাহমুদকে এসব চিঠি দেখাইনি।’—নাসিমা যেন আরো রহস্যজনকভাবে বলতে থাকে, ‘ওকে জানিয়ে কি লাভ, মেজাজ আরো বিগড়ে যাবে, হৈ চৈ বাঁধিয়ে বসবে। অকারণে আমার উপর সন্দেহ করবে। রাগে নিজের মুখ ছিঁড়বে। এখন কি আর ও মানুষ আছে...’—বড়ই হতাশার সুরে বলে নাসিমা, ‘চেহারার সাথে সাথে ওর মনটাও কদাকার হয়ে গেছে। লোকটা নিজে তো দূর্ভোগ পোহাচ্ছে, সাথে সাথে আমাকেও তার দ্বিগুণ দূর্ভোগ না পোহায়ে শান্তি পাচ্ছে না। মাহমুদ মানুষ নয়, শয়তান।’

‘লোকটা অসুস্থ’ —নাসিমাকে বুঝাবার চেষ্টা করি আমি, এটা ভুলে যাও কেন যে, এতোবড়ো একটা দূর্ঘটনার পরও মানুষ হিসেবে মাহমুদ কতোবড়ো হৃদয়ের অধিকারী। যে কিনা নিজের স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিতে পারে অপর একজন অপরিচিত, অজানা রোগীর দেখাশুনা করার জন্যে।’

‘আর এ জন্যে আমাকে ওর কত বিশ্রী, বিকৃত ঠাট্টা-মশকারা শুনতে হয়, তার তুমি কি জানো! তোমাকে তো আর শুনতে হয় না, তোমার কি—তুমি ওরকম বলতে পারো।’ — নাসিমা জ্বলে ওঠে যেন, ‘আমাকে জ্বালিয়ে মারলো লোকটা।’— অশ্র“ মুছতে থাকে নাসিমা।

সাবধানে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিই আমি। কিছুক্ষণ পর নাসিমাও..... ....

.....

‘আমি যাচ্ছ’ি –নাসমিা আমাকে বল,ে ‘তনি দনি ঘরে যাই না। এবার ওদকিকার খবরটা তো নইি। আমার ভাগ্যে শুধু খবরদারী আর খবরদারী!’ নাসমিার কণ্ঠে কৃত্রমি উষ্ণতা প্রকাশ পায়। আমার দকিে শষেবাররে মতো দৃষ্টি নক্ষিপে করে চলে যায় নাসমিা।

পরদনি ঘুম থকেে জগেে দখে,ি ফুলদানীতে লম্বা লম্বা ডাঁটা-অলা একগুচ্ছ র্নাগসি ফুল সাজয়িে রাখছে শংকর। ফুলগুলো দখেে আমার হঠাৎ শবিন্তীর চোখরে কথা মনে পড়ে যায়। এবং হৃদয়টা দারুণভাবে কাঁপতে শুরু কর।ে শংকরকে জজ্ঞিসে কর,ি 'এই ফুল কি তুমি এনছো?'

মাথা নড়েে অস্বীকার করে শংকর। বল,ে 'রত্না এনছে।ে'

'রত্না ক?ে'

'শবিন্তীর বোন।'

এবার রত্নার কথা মনে পড়ে আমার। দখেতে অবকিল শবিন্তীর মতো স।ে

'তা ভতেরে এলো না কনে রত্না?'

'সে তো কারো সাথে কথা বলে না। বড় লাজুক।'

'কথা বলে না কনে?'

'এমনি বোধ হয়।–সইে দুর্ঘটনার পর থকেে কমেন যনে হয়ে গছে।ে ভয় ঢুকে গছেে হয়তো অর মন।ে'-শংকর অনকে ভবে-েচন্তিে বল,ে 'তখন বচোরীর বয়স বড়জোর আট ক'িন'। এখন তো আর কথাই বলতে পারে না। কারো সাথে মলোমশোও করে না। ব্যাস, সবসময় পূঁজো র্অচনা নয়িইে ব্যস্ত থাক।ে'

ফুলগুলো ভালো করে সাজয়িে আমার কাছে তপোয়ার উপর রখেে দয়ে শংকর। আর আমার মনে হচ্ছলিো হাজার হাজার চোখ দয়িে শবিন্তী আমাকে তাকয়িে দখেছ।ে

'ফুলদানীটা বাইরে নয়িে যাও।'

অবাক চোখে আমাকে দখেতে থাকে শংকর।

'এই ফুল আমার ভালো লাগে না।'

ফুলদানীটা বের করে নিয়ে যায় শংকর।

কন্তি পরদনি ফুলদানীতে সইে একই ফুল সাজানো।

'আবার কোত্থকে এলো এই ফুল?'

'সইে রত্নাই দয়িয়ে গলেো। আপনাকে দয়োর জন্যে ইশারা করে বললো।'

হেসে ওঠে। তারপর আমি তাকে স্কটল্যান্ডবাসীদের কৃপণতার উপর চুটকী শোনাতে শুরু করলে হাসতে হাসতে একেবারে খুন যেন। নাসিমা আবার কৃপন লোকদের উপর চুটকী শুনতে খুব পছন্দ করে।

সারাদিন আমরা এক সাথেই ছিলাম। লাঞ্চও করলাম একসাথে। বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। আমার শরীরটা আজ এমন সুস্থ মনে হতে থাকে যে, সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলি, আজ নাসিমার সাথে তার বাসায় যাবো মাহমুদকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

নাসিমাকে আজ বড়ই খুশী খুশী দেখাচ্ছিলো। অনেকদিন পর ওর উদাস আর বেদনাক্রান্ত চেহারায় সুখানুভূতির রক্তিমাভা ঝিলিক দিচ্ছিলো যেন। ওর হাসিতে যৌবনদীপ্ত তরুণীর উচ্ছলতা প্রকাশ পাচ্ছিলো। চুটকী শুনার পর বার বার আমার হাত ধরে হাসির ফোয়ারা ছুটাতে ছুটাতে বলছিলো, 'দোহাই খোদার, বন্ধ করো.....আর না, আর শুনিও না। হাসতে পারছিনে আর।'-হাঁটতে হাঁটতে আমি ঘাস থেকে একটি ফুলের গুচ্ছ ছিড়েঁ ওর খোঁপায় গুজেঁ দিলে আমার প্রতি বিলোল কটাক্ষ হানে ও।

বলে, 'এটা কি প্রেম প্রকাশ করলে?'

'না, বিশ্বস্ততা প্রকাশ করলাম।'-আমি নেহাত বিনীতভাবে বললাম।

'ভীরু হিন্দু!'-নাসিমা যেন ফুসেঁ ওঠে।

কিন্তু সে ফুসেঁ ওঠার মধ্যে কৃত্তিমতা প্রকাশ পায় সবচেয়ে বেশী। খানিকক্ষণ পরে ও হেসে ফেলে। এবং আমার হাত ধরে সবুজ ঘাসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটতে থাকে। একটু পরেই রিচার্ড কটেজের সামনে দাড়িঁয়ে আমরা দুজন।

নাসিমা বলে, 'চলো, আগে চেহারাটা একটু গম্ভীর করে নিই-বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়ে তুলি, তারপর ভেতরে যাই।'

'কি সব ফালতু কথাবার্তা বলছো?'

'আমার মন চায় এই ঘর না জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে খাক করে দিই।'-দাঁতে দাঁত ঘষে বলে নাসিমা।

তারপর কাঠের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। পেছনে পেছনে আমিও। বসন্ত কালের এই মনোরম সন্ধ্যায় আমাদের পায়ের চাপে যে আওয়াজ ওঠছিলো মনে হচ্ছিলো যেন আমরা একরাশ কাচের টুকরোর উপর দিয়ে হাঁটছি। পোর্টিকোতে কেউ ছিল না। চাকর বাকর সব পেছনের নওকরখানায়। পোর্টিকোতে পড়ে থাকা মাহমুদের ইজি চেয়ারখানা খালি। পাশের একটি তেপায়ায় মাহমুদের পাইপ এবং তামুকের টিনও পড়ে আছে।

'মাহমুদ?'

নাসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভীতিপ্রদ শোনায়। পোর্টিকো থেকে দ্রুতপদে হলঘরে চলে যায় নাসিমা। আমিও তার পেছনে পেছনে প্রবেশ করি।

হলঘরের কড়িকাঠে লটকে থাকা রশিতে মাহমুদের ঝুলে-থাকা লাশ তখন ধীরে ধীরে দুলছিলো!

মাহমুদ কঠিন রোগ ভোগ করতে করতে বিরক্ত হয়ে রাগে, ক্রোধে এবং ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যা করে বসে। এর জন্যে দায়ী করে যায় নাসিমাকে। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে অকৃতজ্ঞতা এবং অত্যাচারের সমস্ত দায়ভার নাসিমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ওর বিরুদ্ধে বিরাট এক অভিযোগমাখা চিঠি লিখে রেখে গেছে। ও এক হিন্দুর সাথে প্রেম করে (অর্থাৎ আমার সাথে) । আর হিন্দুর সাথে প্রেম না করলেও আকরামের সাথে প্রেম করেই। আর যদি আকরামের সাথে প্রেম না-ও করে, তার স্বামীকে সে মোটেও ভালবাসে না। সস্তা নির্লজ্জ ও অকৃতজ্ঞ মেয়ে। যার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মাহমুদ আত্মহত্যা করেছে।

কয়েক মিনিট আগে এলেও আমরা মহমুদকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম। কারণ বাইরে তেপায়ার উপর রাখা পাইপ থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছিল।

তিন চার দিন পর কথাটা নাসিমাকে কথাটা জানালে, সে কিভহুটা রাগতস্বরে বলে, 'কিভাবে আসবো, তুমি চুটকী শুনাচ্ছিলে যে। বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি আমার কথা শুনলে না। চুটকী শুনাচ্ছো তো শুনাচ্ছোই। তুমি দেরী করানোর জন্যেই তো আমার স্বামী বেচারা ...' নাসিমা ফুঁপিয়ে ওঠে।

'ও তো অনেক বছর থেকেই জীবিত থেকেও মৃত-আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, 'তুমি স্রেফ তার জীবিত লাশটাই আগলে বসে ছিলে ।'

'আগলে বসে থাকলে আমি ছিলাম, তুমি তো আর নও'-রেগে গিয়ে বলে সে, 'ও তো তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকে নি! তাহলে?' – নাসিমা এমন এক দৃষ্টিতে তাকায় যেন আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে আর কি! তারপর অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, 'সবসময় তোমাদের হিন্দুদের কারণেই আমাদের মুসলমানদের উপর বিপদ আপদ এসে পড়ে। না তুমি এই উপত্যকায় আসতে , না আমার স্বামী আত্মহত্যা করতো। কিন্তু আমার জানা উচিত ছিল, এই জাতটাকে আমাদের কোন উপকার হবে না। দেখো...।' নাসিমা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, 'আমি দিনরাত তোমার দেখাশুনা করলাম, আর সেই তোমার কারণেই আমার স্বামীকে মরতে হলো। তা শত হলেও শীবাজীর বংশধর তো.....!'

'ম্যাডাম, প্রথম কথা হচ্ছে, আমি শিবাজীর বংশধর নই। দ্বিতীয়তঃ শুধুমাত্র এক শিবাজীকেই মোগল বাদশাহীর পতনের জন্যে দায়ী করা যুক্তিসংগত নয়। এতবড় বাদশাহীর পতন একজন মাত্র মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। এ সমস্ত ব্যাপারগুলোকে, আসলে যদি গভীরভাবে যাচাই করা যায়.....।'

‘না আমি এ সমস্ত ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতে প্রস্তুত নই। আপনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান।’

‘এই নিয়ে দুইবার আমি আপনার ঘর থেকে বিতাড়িত হচ্ছি। কিন্তু যাওয়ার আগে দু’তিনটা প্রশ্নের জবাব চাই-।’

‘বলুন-বলুন-তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন এবং কেটে পড়ুন।’- নাসিমা ছোট একখানি রুমাল দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে করতে বলে।

‘প্রথম কথা হচ্ছে , এখন আপনার প্রোগ্রাম কী? যে কামনার রাজ্যে বিচরণ করার জন্যে আপনি উন্মুখ হয়ে ছিলেন- অপ্রত্যাশিতভাবে খুব দ্রুতই তা পেয়ে গেছেন। আমার মনে হয় এখন তাড়াতাড়ি এই উপত্যকা ছেড়ে বাইরে আপনার দেশে চলে যাবার জন্য আপনি অস্থির হয়ে আছেন। ক্বাষ্ট সভ্যতার পবিত্র মাটিকে.....’

‘মোটেই না’- নাসিমা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, ‘আমি এখানেই থাকবো। এই উপত্যকার মাটিতেই আমার সমাধি হবে, যেখানে আমার স্বামীর লাশ সমাধীস্ত।’

‘কিন্তু তুমি তো এই জায়গাটাকে ঘৃণা করতে। তুমি এখনো সুন্দরী,যুবতী এবং উচ্চবংশজাত ধনী কণ্যা ।এ ছাড়াও নিজে একজন ধনী বিধবা। স্বামী তোমার নামে রেখে গেছে অনেক ধনসম্পত্তি।’

‘কিন্তু এ থেকে তুমি এক পয়সাও পাবে না। আছো কোন খেয়ালে তুমি?’

‘আমি নিজের জন্য ভাবছি না। ভাবছি, তুমি এখন যত তাড়াতাড়ি এই অপয়া উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে পারো তত মঙ্গল। নিজের দেশে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সাথে এমন জীবন যাপন করো- যা তুমি প্রথম দিকেই চেয়েছিলে। হয়তো বা ওখানে তুমি নিজের পছন্দমতো দ্বিতীয় স্বামী পেয়েও যেতে পারো। তাছাড়া আকরাম তো তোমার প্রতীক্ষায় আছেই।‘

‘আমি কোথাও যেতে প্রস্তুত নই।‘-নাসিমা মেঝেতে ধপ করে পা-জোড়া রেখে বলে, ‘মাহমুদ আমার উপর যে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়েছে-আমার রক্ত দিয়ে তা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করবো।’

‘কিন্তু এখন এই জনমানবহীন বিরান, জঙলী এলাকায় স্বামী ছাড়া তোমার পক্ষে একা বাস করাটাও তো বিপজ্জনক।’

‘আমি কোনো বিপদকে ভয় করি না।’ –নাসিমা গর্জে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রাগে ওর চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। এবং সে আমাকে একটা আঙ্গুল দিয়ে গেট দেখিয়ে দেয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই আমি।

নাসিমা আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে বলতে থাকে, ‘আর দেখো, ফের যদি তুমি কখনো ওই কিল্লায় থাকো, আমি নিজে গিয়ে তোমার গলা চেপে ধরবো। বুঝলে?’

‘এখন আমি মরি-বাঁচি তোমার কি’-হাঁটতে হাঁটতে বলি আমি, আমার তো ইচ্ছে আজ রাত থেকেই কিল্লায় থাকব।’

নাসিমা এক ঝটকায় আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, ‘খবরদার, যদি তুমি কিল্লায় থাকো! নতুবা আমি তোমাকে যেতে দেবো না। চাকরদের নওকরখানায় বন্দী করে রাখবো।‘

‘কিন্তু এখন তো তুমি আমাকে ঘর থেকে বের করে.....’

সে বলে, ‘এটা আমার ঘর। আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।তুমি কি আমার স্বামী যে, ভয় দেখাচ্ছো?’

আমি বললাম, ‘যাকে তোমার স্বামী স্বয়ং ভয় দেখাতে পারেনি, আমার সাধ্য কি ভয় দেখাই!’

‘গেট আউট!’ চীৎকার দিয়ে ওঠে নাসিমা।

আমি চলে গেলাম।

বাঘিনীর মতো হিংস্র চেহারা নিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে।

সে রাতে আমি কিল্লায় ফিরে আসি। নাসিমার আদেশ লঙ্ঘন করার উদ্দেশ্য নয়। বরং কিল্লা আমাকে ডাকছিলো। প্রতি মুহুর্তেই কিল্লার দিকে তাকালে আমি অনুভব করি যেন ও আমাকে নিজের বুকে তুলে নেয়ার জন্য ডাকছে। কিল্লা যেন আমার অনুপস্থিতিতে কত বিষণ্ণ। আর অদ্ভুত এক আক্ষেপমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে যেন আমাকে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

আমি কিল্লার ভেতর ঢুকে পড়ি। আর প্রতিটা জিনিষ আমাকে যেন সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

রাত প্রায় দু’টোর দিকে ও এলো। এখন তো ধরতে গেলে আমার জানাই হয়ে গেছে, ও কখন আসে। রাত অর্ধেকের আগে ও কখনো আসে না। যখন পর্যন্ত চোখ ভার করে ঘুম না নামে, ও আসে না। আজ তো ওর আসার জন্যে আমি প্রথম থেকেই সব ব্যবস্থা পাকা করেই রেখেছিলাম। বাতি নিভিয়ে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমার চারপাশের অন্ধকার ক্রমশঃ গভীরতার দিকে যেতে থাকলে ও এলো।

সবচেয়ে আগে এলো সেই কর্পূরের সুবাস। এবং ধীরে ধীরে আমার সমস্ত শরীর অবশ হতে হতে এক সময় এক অস্পষ্টতার রাজ্যে চলে যায়। তারপর আমার পালঙ্ক যেন শূন্যে স্থির হয়ে আছে।আর আমি তার উপর শোয়া। এবং আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে

আমাকেই নিরীখ করছে একটি চেহারা।

‘তুমি আমাকে ভুলে গেছো লালী?’

‘না শিবন্তী।’

‘তাহলে এতোদিন কিল্লায় আসোনি কেন?’

‘কে যেন আসতে দিলো না।’

‘আমি প্রতিরাত এই কক্ষে তোমার প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি।’

‘আমি খুব অসুস্থ ছিলাম শিবন্তী, আমার কোন হুশঁ ছিলো না।’

‘আমার তো হুশঁ ছিলো এবং প্রতি মুহূর্তে তোমার প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। কিন্তু আর বেশীদিন আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো না।’

‘কি বলছো তুমি?’

‘আমার যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে।’

‘কোথায়?’

‘তা তো বলতে পারবো না।’

‘কখন যাবে?’

যেদিন তুমি আমাকে এই কিল্লা থেকে মুক্ত করবে।’

‘তাহলে আমি তোমাকে সারাজীবনেও মুক্ত করবো না।’

‘তুমি কি চাও আমি আজীবন এই জনমানবহীন নিঃসঙ্গ বিরান কিল্লায় একা একা তিলে তিলে মরতে থাকি? আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। লালী, আমাকে মুক্ত করো-মুক্ত।’

‘কিভাবে শিবন্তী?’

‘আমাকে আলোকিত করো-আমাকে আলোকিত করো-আলোকিত করো।’

ওর আওয়াজ ক্রমশ দূর হতে থাকে।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় ও। আমিও ওর পেছনে পেছনে যেতে থাকি। দ্রুত পা ফেলে অনেকটা হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে ও। প্রথম করিডোর থেকে দ্বিতীয় করিডোরে পৌঁছে। আমি ওর পেছনে পেছনে যেতে থাকি। ওর কণ্ঠস্বর আমার কানে গুঞ্জন তোলে।

‘আমাকে আলোকিত করো-আমাকে আলোকিত করো-আলোকিত করো। লালী, আমাকে আলোকিত করো, আমাকে মুক্ত করো।’

আধো আলো আধো আঁধার করিডোর ধরে ও চলে যাচ্ছে। একটি সাদা কাপুরী বাতির মতো চেহারা আলোয় আলোকিত কারে কাচের জানালায় দিকে যেতে থাকে ও।

'শিবন্তী-শিবন্তী!' আমি জোরে জোরে চীৎকার দিয়ে উঠি।

কাঠের বড় করিডোরে আমার সে আওয়াজ গুঞ্জন তোলে.....শিবন্তীকে বার বার ডেকে ডেকে চলে যায়।

অবশেষে আমি ফিরে এলাম। এবং টর্চ নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলাম। যেখানে এসে শিবন্তী অদৃশ্য হয়ে গেছে, আমি আবারো সেখানে এলাম। কিন্তু কেউ নেই।

'শিবন্তী, শিবন্তী! কোথায় তুমি? কোথায়?'

আমার আওয়াজ হাওয়ায় মিশে অনেকদূর পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে। পরে দূরে কাঠের করিডোরে মোড়ে একটি আলোক-রশ্মির উপর একটি ছায়া, পরে ছায়া এবং কায়া এক সাথেই এদিকে আসছে দেখা গেলো। কাছে এলে দেখি শংকর। হাতে একটা লন্ঠন।

আমার আপাদমস্তক কাঁপছিলো। শংকর আমাকে কিছুই বললো না। শুধু হাতটি শক্ত করে ধরে আমার কক্ষে নিয়ে এসে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে আমাকে।

পরদিন আমার মনমস্তিস্ক থেকে কুয়াশাচ্ছন্নতা কেটে যায়। আমার কাছে মনে হয় যেন হেয়ালীপূর্ণ, জটিল এবং ভুল পথে দাঁড়িয়ে আছি আমি। জটিলতার জট খোলার পথ এখনো আমার কাছে অজানাই বলেই মনে হলো।

তারপর একসময় পথও যখন খুয়ে যায়, আমি সর্বপ্রথম রত্নার সাথে কয়েকটি আলাপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলি।

মন্দিরের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে আমি একসময় নদীর তীরের ফুল বাগানে লুকিয়ে-থাকা রত্নাকে ধরে ফেলি।

রত্না একখানি থালাতে গোলাপ ফুল সহ অন্যান্য ফুল নিয়ে ভবানী মাতার জন্য মালা গাঁথছিলো। তার হাতের আঙ্গুলগুলো লতার মতো লম্বা আর চোখ জোড়া বেশ রহস্যময়তায় ভরা।

আমি কাছের একটি ফুল গাছ থেকে কিছু ফুল ছিঁড়ে ওকে দিতে দিতে বললাম, 'তুমি কি সত্যিই কথা বলতে পারো না?'

না-সূচক মাথা নাড়ে রত্না।

‘সত্যি সত্যিই কি তুমি কথা বলতে পারো না?’

রাগের সাথে এবারও সে মাথা নাড়ে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার পা জোড়া দেখতে থাকি। সেই গোলাপী পদ্মচরণ, অদ্ভুত সুন্দর, কোমল এবং পাতলা। এমন সুন্দর পা আজ পর্যন্ত আমি কোথাও দেখিনি।

ও ভয় পেয়ে পা জোড়া নদীর পানিতে ডুবিয়ে রাখে। পানির ভেতরে পা জোড়া আরও সুন্দর দেখাতে থাকে।

এবার পা জোড়া পানি থেকে তুলে তাড়াতাড়ি শাড়ীর ভেতরে লুকিয়ে ফেলে রত্না।

‘আমাকে বলো, কে তোমার বোনকে মেরেছে, জেফারসন সাহেব?’

রত্না মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়। যেন বলছে আমি জানি না।

আমি তার চোখে চোখ রেখে বললাম, ‘তুমি আমার থেকে কিছু লুকাচ্ছো বলে মনে হচ্ছে। সত্যি করে বলো তো তোমার বোনের খুনী কে?’

আমার কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা দেখে ও ভয় পেয়ে যায়। চোখে অশ্রু দেখা দেয়। গোলাপী চেহারা শাদা হয়ে যায়। এবং রত্না থর থর করে কাঁপতে থাকে।

আমি ওর হাত ধরে বললাম, ‘তোমাকে বলতেই হবে, এটা আমার জীবন-মরনের প্রশ্ন।’

রত্না বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার চেহারা নিরীখ করতে থাকে। পরে হঠাৎ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে মন্দিরের ভেতর একটি গোপন দরোজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।আমি দৌড়ে কাছে গেলে দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মোড় পরিবর্তন করে মন্দিরের সামনে দরোজায় এসে দেখি, ওটাও ভেতর থেকে বন্ধ। আমি আবার নদীর তীরে ফিরে আসি। যেখানে রত্না নিজের থালাটা রেখে গেছে। থালার উপর অর্ধসমাপ্ত ফুলের মালাটা তেমনি পড়ে আছে।

অসমাপ্ত মালাটা তুলে নিই আমি। এবং আস্তে আস্তে সমাপ্ত করতে থাকি। মালা গাঁথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ আমার কাঁধে যেন কার হাতের স্পর্শ করি অনুভব করি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রত্না। মুহূর্তের জন্য আমার কাছে মনে হলো যেন শিবন্তী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু না, ও রত্না। তাড়াতাড়ি পূঁজোর থালাটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় রত্না। এবং আমার কোলে একটুকরো কাগজ ফেলে দিয়ে যায়। আমি তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরোটা খুলে দেখি তাতে দেবনাগরী ভাষায় শুধু একটি মাত্র নাম লিখা।

‘গোকুল দাস।’

গোকুল দাস? ভালো করে পড়লাম আমি। গোকুল দাস কে? এতোদিন এই গাঁয়ে আছি, গোকুল দাস নামের কারো সাথে তো আমার দেখা হয় নি। এই গোকুল দাস কে?

ঘাড় ফিরিয়ে রত্নার দিকে তাকায় আমি। কিন্তু রত্না তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাগজের টুকরোটা যত্ন করে পকেটে পুরে কিল্লায় নিজের কক্ষে ফিরে আসি আমি।

রাতে শোবার আগে শংকরকে জিজ্ঞেস করি আমি, 'আচ্ছা এই গোকুল দাসটা কে?'

পানির জগ এবং গ্লাস এনে আমার পালঙ্কের কাছে বড় তেপায়ায় রাখছিলো শংকর। হঠাৎ তেপায়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে যেন সামলে নেয় সে। কিন্তু হঠাৎ হাত ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেলে কাচের জগ আর গ্লাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

'শংকর!'

'সরি স্যার!' বলেই শংকর বেরিয়ে যায়।

কিছক্ষণ পর ঝাড়ু নিয়ে এসে মেঝেটা পরিষ্কার করে কাচের টুকরোগুলো একটি টুকরিতে ভরে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। পরে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলে আমি আবারো জিজ্ঞেস করি, 'এই গোকুল দাস-লোকটা কে?'

শংকরের হাত থেমে যায়। বলে, 'আমি চিনি না সাহেব। এই গাঁয়ে তো গোকুল দাস বলে কেউ নেই। আমি চিনি না গোকুল দাস কে। তবে আপনি নম্বরদারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

শংকর কিল্লার ভেতরের চাবিগুলো আমাকে দিয়ে সালাম জানিয়ে বিদায় নেয়। প্রতিদিনকার মতো কিল্লার ভেতরের সব দিক বন্ধ করে দিই আমি। এবং নিজের কক্ষে এসে বই খুলে পড়তে শুরু করি।কিন্তু জানি না কেন, আজ আমার চোখে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম নেমে আসে। আজ আমি শিবন্তীর সাথে মিলিতও হতে চাইলাম না। মনে মনে কামনা করছিলাম, আজ যেন ও না আসে। আজ আমার মন অন্য এক চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলো। আমি কামনা করছিলাম তাড়াতাড়ি যেন সকাল হয়ে যায়। এবং কাজে লেগে যাই। সিদ্ধান্ত একটা আমি নিজেও নিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু শিবন্তী চলেই এলো। না এসে থাকতে পারলো না।

আমি শিবন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আমার সময় কি সুবাস নিয়ে আসো? আমার শিরা-উপশিরা বিষিয়ে যায়। সমস্ত শরীর যেন খিঁচতে শুরু করে।'

‘এটা কালের সুবাস।’-শিবন্তী দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে, ‘এই সুবাস ছাড়া আমি তোমার কাছে আসতে পারি না। এটা অতীত হয়ে যাওয়া সময়ের সুবাস। যেটা ভবিষ্যতের জন্যে জমা থাকে। যদি কেউ আবার বর্তমানে ফিরে আসতে চায়-এই সুবাসের সাহায্য নিতেই হবে। এ ছাড়া আমি তোমার কাছে আসতে পারবো না।’

‘তার মানে তুমি আমার জন্যে তোমার অতীতকে খরচ করছো? এ পর্যন্ত কতটুকু খরচ করেছো?’

‘ব্যাস, আর মাত্র একরাত বাকী আছে।’-শিবন্তী উদাসমাখা চেহারা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ‘আমার অতীতের সাতটি বছরের বিনিময়ে একটি রাত পাই-যা তোমার জন্য ব্যয় করি। এবং এভাবেই আমি আমার সঞ্চিত সমস্ত অতীতই তোমার জন্যে খরচ করে ফেলেছি। আর মাত্র একরাত তোমার কাছে আসতে পারবো।’

‘শিবন্তী.....!’ আমি কিছু বলতে চাইলে তাড়াতাড়ি আমার ঠোঁটে আঙ্গুল চাপা দেয় ও।

‘না। আজ তুমি কিছু বলতে পারবে না। আজ আমাকেই বলতে দাও.....ওরা আমাকে ভালোবাসতে দেয়নি। ওরা আমার মূল্যবান নারীত্বকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ওরা জানে না নারীর মূল সম্বলই ভালোবাসা। এবং যে নারী প্রেম-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত তার জন্য জীবনটাই হয়ে পড়ে অর্থহীন আর অসম্পূর্ণ। আমি নিজেই নিজের জীবনটাকে পরিপূর্ণ করার জন্যে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।’

‘কিভাবে তুমি নিজেকে পরিপূর্ণ করবে? আমার সাথে প্রেম করে?’

‘না, নিজেকে মুক্ত করে-আমি এই কিল্লার চার দেয়ালে বন্দী। একজন কয়েদীর মতো শৃঙ্খলিত। কয়েদী প্রেম করতে পারে না। প্রেম করার জন্য মুক্ত জীবন দরকার।’

‘তুমি তো আজ পণ্ডিতের মতো কথা বলছ’।
‘ভুলে যেও না আমি একজন পণ্ডিত ব্যক্তির মেয়ে। আমি অনেক পড়ালেখা করেছি – যা কিছু আমাদের গ্রন্থে আছে এবং যা এখনো অনেক মূল্যবান’।
‘আমি যদি তোমাকে মুক্ত করে দিই, - যা আমি এক রকম সিদ্ধান্তই করে ফেলেছি, -আমি বললাম, ‘তাহলে তো তুমি সম্ভবতঃ আমার কাছে আর আসবে না। তবে এটাও ঠিক.....শেষ মিলনের জন্যে পুরো অতীতটা খরচ করে ফেলাও বোকামি’।
‘তাহলে তুমি নারী জাতটাকেই চেন না’। - শিবন্তী ফুঁপিয়ে ওঠে। আমার কপোলের সাথে নিজের কপোল চেপে ধরে। ওর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু আমার কপোল ভিজিয়ে দিলে আমি অনুভব করতে থাকি – শিবন্তী কাঁদছে। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকি।
‘আমি তোমাকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। অর্থাৎ, তোমাকে মুক্ত করার জন্যে নিজের জীবনকে বাজী রাখবো আমি। প্রতিদানে তুমি নিজের চেহারাটা আর একবার দেখাবে তো? যদিও আমি জানি, আত্মা একবার মুক্ত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না’।

‘আমি ফিরে আসবো’- শিবন্তীর কণ্ঠস্বরে একরাশ ভরসা প্রকাশ পায়, ‘আমি অবশ্যই আসব.....এক পলকের জন্যে হলেও আসবো ঠিকই’।
আমি তার ঠোঁট জোড়া নিজের মাথায় বুলিয়ে নিলে ও ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে সেই কর্পূরের সুবাসও। কিন্তু আজ আমি ওকে যাবার বেলায় বাধা দেয়ার চেষ্টাও করলাম না।আমি জানিও না সে কখন গেছে। কোন পথ দিয়ে গেছে। গভীর নিদ্রায় ডুবে ছিলাম আমি।

পরদিন স্নান করে নাস্তা সাথে নিয়ে গাঁয়ের পথে রওনা দিই। সর্বপ্রথম আমি নম্বরদার রবি দাসের উঠোনে গিয়ে তাকে খপ করে ধরে ফেলি।

‘গোকুল দাসটা কে?’ –আমি তাকে সজাসুজি প্রশ্ন করি।
প্রশ্নটা এমন দ্রুত হয়ে যায় যে রবি দাস একেবারে হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে বসে। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
‘গোকুল দাস?’ আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করে ও।
‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, গোকুল দাস –এবং তমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি ওকে চেন।‘
রবি দাস নিজেকে সাম্লে নেয়। বলে, ‘না সাহেব, আমি কোন গোকুল দাসকে চিনি না। আমাদের গাঁয়ে গোকুল দাস নামে কেউ থাকে না’।
আমি অনেকক্ষণ তাকে দেখতে থাকি। আমার মনে হয় যেন ও আমার কাছ থেকে কিছু লুকচ্ছে। তবে এখন আর আমি তার কাছ থেকে কোন তথ্য পাচ্ছি না, এতা ঠিক।
পরে কিছু না বলেই ওর বাড়ী থেকে চলে আসি আমি। এবং নাছিমার কাছ থেকে জেনে নেয়ার জন্যে রিচার্ড কটেজের দিকে রওনা দিই। যেটা এখান থেকে খুব একটা বেশী দূরে নয়।

নাসিমা কটেজের বাগানে চেরী ফুলের সাথে লুটিয়ে পড়া ডালপালার নিচে বসে বই পরছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বড় নির্লজ্জ, নিষেধ করা সত্ত্বেও এসে পড়ো’।
‘বেশ খুশীতে আছো মনে হচ্ছে’। আমি বলি।
নাসিমা একেবারে জ্বলে ওঠে, ‘তুমি কি চাও চিতায় জ্বলে সতী হয়ে যাই?’
‘আমি এখন তোমার সাথে বৃথা ঝগড়া করতে আসিনি’।
‘তাহলে কি প্রেম করতে এসেছ?’
‘বিষাক্ত মৌমাছির সাথে কে প্রেম করবে?’ ---আমি বললাম, ‘ম্যাডাম, আমি তো জানতে এসেছি, তুমি গোকুল দাস নামে কাউকে চেন কিনা?’

‘না—সে বাঁকা স্বরে জবাব দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজের কথার বিরোধিতা করে চিৎকার দিয়ে ওঠে, ‘হ্যাঁ.....চিনি গোকুল দাসকে। ওই কিল্লার ডাকবাংলোর নায়েব বেয়ারা ছিল---ব্রিটিশ আমলে। কিন্তু এখন তো ও এখানে থাকে না। গত এক বছরের মধ্যে ওকে কেও এ গাঁয়ে দেখেনি’---পরে একটু থেমে বলে, ‘গোকুল দাসের সাথে তোমার কি প্রয়োজন?’

আমি বললাম, ‘আমি শিবন্তীর রহস্যজনক অন্তর্ধান প্রসঙ্গে জানতে চাই’।

‘উহ!’—নাসিমা হৈচৈ শুরু করে দেয়। বলে, ‘সেই পেত্নীটা এখনো তোমার পেছনে পড়ে আছে?’

আমি নীরবে তাকে দেখতে থাকি।

‘দেখে নিও একদিন এই পেত্নী তোমার জান নিয়ে ছাড়বে। একদিন তুমিও নিজের লাশ দেখতে পাবে এই বিছানায়’। নাসিমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

কটেজ থেকে বেরুতেই জান মোহাম্মদ বাবুর্চির দেখা পেয়ে যাই আমি।

লোকটা একরাশ ঝোপঝাড়ের পাশে কনুই ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই সামনে এগিয়ে আসে।

‘হুজুর, গোকুল দাসের ব্যাপারে আমি অনেক কিছু বলতে পারি আপনাকে’।

ওকে দশ টাকার একখানি নোট হাতে ধরিয়ে দিলে লোকটা সাথে সাথে পকেটে পুরে ফেলে নোটখানি।

‘ও এই গাঁয়ে থাকে না’। --জান মোহাম্মদ বলতে থাকে, ‘এই উপত্যকার শেষ মাথায়’ ---জান মোহাম্মদ শেষ মাথার দিকে ইশারা করে, ‘সবার থেকে আলাদা একা একা থাকে সে। কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে না’।

‘কি কাজ করে?’

‘জানি না, তবে ঘরের সাথেই তার পুরনো একটা গম পিষার চাক্কি আছে। এই উপত্যকার একেবারে শেষ মাথায়’।

‘চাষবাস করে?’

‘জোয়ারের একটা ছোট ক্ষেত আছে। ও থেকে টেনেটুনে কোন রকমে খোরাকী চলে তার’।

‘ছেলেপিলে আছে?’

‘আমার মনে হয় ও একাই থাকে ওখানে’।

‘তুমি জান কি করে?’

‘দু’বছর আগে গ্রামে বেশ বড়সড় একটা বন্যা হয়েছিলো। গ্রামের চাক্কি সে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ঘটনা চক্রে আমার ঘরের সব আটা ফুরিয়ে যায়। আমি নম্বরদার রবি দাসের কাছে সমস্যাটার কথা বললে সে অনেক দূরের ওই চাক্কি থেকে গম পিষে আনতে পরামর্শ দেয়’।

‘সে-ই চাক্কির মালিকের নাম বলেছিল?’

‘হ্যাঁ। বলেছিল, --গোকুল দাসের চাক্কি থেকে পিষিয়ে নিয়ে এসো। তবে এ কথাও জানিয়েছিল যে গোকুল দাস কারো সাথে মেলামেশা করে না। তাই কথাটা আমার পুরো মনে আছে’।

‘তাহলে রবি দাস আমাকে ভুল বলল কেন?’ –নিজের মনের কাছেই যেন প্রশ্নটা করলাম। তারপর ঢালু বেয়ে নিচে গ্রামের দিকে চলতে থাকি আমি।

আমার চেহারায় ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। গোকুল দাসের সাথে দেখা করাই শ্রেয় মনে করি। সাথে থ্রী নট থ্রিটাও নিয়ে যাবো।

শঙ্করের কাছে শিকারের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আমি একাই থ্রী নট থ্রি এবং শিকারের অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে রওনা হই। জান মোহাম্মদের কথা মতো পুরনো চাক্কির দিকেই হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ পরই নদীর তীরে একটি ত্রিকোণ বিশিষ্ট ঢালু জায়গায় এসে পৌঁছি। এখান থেকে নদীর একটি অংশ তীব্র স্রোতের সাথে একটি পুরনো চাক্কির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। চাক্কির সাথেই মাটির একটা পুরনো ঘর ছিল। পাশেই এক চিলতে যোয়ারের ক্ষেত।

চাক্কিটা দেখে মনে হল যেন অনেকদিন থেকে এটি অব্যবহৃত আছে। আমি চাক্কিটার ভেতরের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে আস্তে আস্তে দেখতে থাকি। এই ফাঁকে আমার পিঠ চাক্কির ভারী পাথরের একটি অংশের সাথে লেগে যায়।

পাথরের অংশটা আপনা থেকে চলতে শুরু করলে আমি ভয়ে লাফিয়ে পড়ি। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, একজন দীর্ঘাঙ্গ কৃষক দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ে তার ছেঁড়া একটা কামিজ এবং পরনে মোটা পাজামা। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বড়ো বড়ো দাঁত বের করে হাসতে থাকে।

‘সাহেব, এদিকে কোথায় শিকার করতে এলেন?’ –ভারী স্বরে জিজ্ঞেস করে আমাকে।

আমি থ্রী নট থ্রিটা ওর দিকে তাক করে জিজ্ঞেস করি, ‘তুমি গোকুল দাস?’

নির্বিকার ভাবে জবাব দেয় ও 'হু'।

'শিবন্তীর হত্যাকাণ্ডে তুমিও অংশ নিয়েছিলে?'

হঠাৎ লোকটার চোয়াল দুলে ছোট ছোট গভীর চোখজোড়ায় একরাশ ভয় যেন চমকে ওঠে। চোখের পুত্তলী জোড়া দ্রুত ঘুরে যেন স্থির হয়ে যায়। তারপর লোকটা আস্তে আস্তে আমার দিকে এগুতে থাকে।

আমি লক্ষ্যস্থির করে ফেলি। তার দিকে.....

লোকটা চালাকি করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার উপর হামলা করার চিন্তা কর নেয়। কিন্তু আমি আগেই বুঝে নিই। তাই যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করি। লোকটা যখন ধরেই নেয় তার আর কোন চালাকই খাটবে না---অগত্যা মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে নিতান্তই নরম সুরে বিড় বিড় করতে থাকে।

'সাহেব, মাফ করে দাও, আমি দোষী নই। আমি খুন করিনি। আমাকে মেরো না। আমি শিবন্তীকে খুন করিনি। আমি স্রেফ তাকে ধরে আনতে গিয়েছিলাম'।

'তোমার সাথে আর কে ছিল?'

'রবি দাস'।

'রবি দাস!' – খুশী চেপে রাখতে ব্যর্থ হই আমি।

'হ্যাঁ, রবি দাস---গাঁয়ের নম্বরদার, পণ্ডিত হরি দাসের ভাই। জেফারসন সাহেব কাজে খুশী হয়ে আমাকে ত্রিশ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন'।

'তারপর কি হল?'

'গোকুল দাস হঠাৎ চুপ করে যায়। ওর চাহারা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বাইরের দিকে কান খাড়া করি। বাইরে ক্ষেত থেকে কিসের যেন শব্দ আসছিলো। মৃতের মতো সাদা চেহারা নিয়ে গোকুল আমাকে চুপ করে থাকার ইশারা করে। এবং নিজে পা টিপে টিপে বাইরে যায় ব্যাপারটা দেখার জন্যে। কিছুক্ষণ পর সেই শব্দ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। এবং চাক্কিও ভেতরে গভীর নিস্তব্ধতা জেঁকে বসে।

দশ মিনিট চলে যায়। বিশ মিনিট। ত্রিশ মিনিট।

গোকুল দাস আর ফিরে আসে না। বুঝতে পারি, সে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। তার কথা কতটুকু সত্য, তাও বা কে জানে।

কিন্তু এখন আর কিই-বা করা যাবে। চাক্কি থেকে বেরিয়ে ওকে খুঁজতে থাকি আমি নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে চাক্কির দেয়ালের কাছে গোকুলকে দেখতে পাই। পানির কাছে শুয়ে ছিলো সে। মাথাটা পানির নীচে, পা জোড়া উপরে মাটিতে ঘাসের কাছে তেরছাভাবে ছড়িয়ে আছে।

পানি থেকে গোকুলের মাথাটা তুলে দেখি, কে যেন মাথায় জোরে আঘাত করেছে। কেটে গেছে মাথাটা। বেচারা সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

মাথাটা পানির ভেতর ফেলে রেখে আমি উঠে দাঁড়াই। দূরে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে দেখি, বিরাট এক খন্ড মেঘ আকাশটাকে ঘিরে ফেলেছে। অন্ধকার ও চারদিকে আস্তে আস্তে ঘনীভূত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি এ স্থান ত্যাগ করা উচিত আমার।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমি কিল্লার কাছাকাছি এসে পৌঁছি। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন কেউ আমাকে অনুসরন করছে। একজন নয়-দু'জন-না না, দু'জন নয়, যেন কয়েকজন- আজ হয় ওদের জীবন থাকবে, না হয় আমার।

অত্যন্ত সাবধানে, সতর্ক পায়ে কিল্লার দিকেই আসছিলাম।

অত্যন্ত সাবধানে, সতর্ক পায়ে কিল্লার দিকে আসছিলাম।

অন্ধকার ক্রমশ: বাড়তে থাকে। আধ ঘন্টা পর বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে অক্ষত অবস্থায় কিল্লার কাছে এসে পৌঁছি। যেখানে শংকর ভেজা কাপড়ে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা লম্বা ফৌজী ওভারকোটের ভেতর থেকে লন্ঠনের মৃদু আলো ঠিকরে পড়ছিলো বাইরে।

আমার ভেজা কাপড়গুলো নিয়ে একখানি দঁড়ির উপর টাঙ্গিয়ে দেয় শংকর। তারপর গরম পানি করে আমার স্নানের ব্যবস্থা করে।

এবং পর পর দু'পেগ ব্রান্ডি দেয়-যাতে ঠান্ডা ধরতে না পারে।

'আপনি শুয়ে পড়–ন- আজ সারারাত জেগে জেগে আপনার দেখাশোনা করবো আমি। আপনার ঠান্ডা লেগে গেছে।'

কিন্তু আমি অস্বীকৃতি জানালাম। আজ হচ্ছে সেই রাত- যে রাতে শিবন্তী খুন হয়েছিল। আজ তো সে আসবেই এবং আমাকে শিবন্তীর খুনের প্রতিশোধ ও নিতে হবে। তার হাতে এখন আর তেমন সময় ও নেই। আজ তাকে আসতেই হবে। এবং আপনা হাতেই নিজের মুখোশ খুলে আমার কাছে ধরা দিতে হবে।

এজন্যে শংকরের পরামর্শ মানতে অস্বীকার করি আমি। এবং তাকে অন্যান্য দিনের মতো তাড়াতাড়ি কিল্লা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিই। তারপর কিল্লার সব দরোজা বন্ধ করে দিলাম। একমাত্র নওকরখানার রাস্তাটা ছাড়া, একটা রাস্তা তো রাখতে হয়। অন্তত: ভেতরে আসতে যেন তার কোন অসনুবিধে না হয়। যদিও তা বেকার। কারণ, একটা না একটা রাস্তা সে বের করে নেবেই। সব দরোজা বন্ধ করে নিজের কক্ষে এসে বসে পড়তে শুরু করি। পরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

জানি না কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার শরীরের ভেতর থেকে যেন একটা এলার্ম বেজে ওঠে। এবং আমি ধড়মড় করে উঠে বসে পড়ি। বাইরে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিলো যেন। জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ আসছিলো। কিন্তু আমার অনুভূতি শক্তি সে শব্দগুলোকে একটি বিশেষ আকৃতির ভেতরে আকর্ষণ করতে থাকে। সে আওয়াজকে ছাপিয়ে অন্য যে আওয়াজটি আসছিলো সেটি কারো থেমে থেমে নি:শ্বাস নেয়ার মতো আওয়াজ। অথচ আওয়াজটা বেশ চাপা। মনে হচ্ছিলো যেন আমার কক্ষে কেউ ঢুকে পড়েছে।

বেশ কয়েক মূহুর্ত তো আমি সম্মোহিতের মতোই ছিলাম। কি-ই বা আর করা যায়। চারদিকেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। কারো পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছিলো না। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি বেশ সজাগ ছিলো। আমাকে যেন বলছিলো, কেউ আমার কক্ষে ঢুকে পড়েছে। ধীরে ধীরে তোমার বিছানার দিকে এগোচ্ছে।

নি:শব্দে অতি সতর্কতার সাথে আমি শুয়ে শুয়েই খাটের পায়ের দিকে যেতে থাকি। ও যে রকম ইঞ্চি মেপে মেপে আমার বিছানার দিকে আসছিলো, আমি তেমনি মেপে মেপে অত্যন্ত ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরে যাচ্ছি। এবার বিছানার অর্ধেকটা খালি। আমার শরীর বিছানার পায়ের দিকে সরে গেছে। নীচে নামতে গেলেই শব্দ হবে।

তবুও আমি অতি ধীরে গুছানো পা জোড়া আস্তে করে নীচে মেঝের দিকে ফেলতে লাগলাম। খুব সন্তপর্ণে শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করার মতো করে নি:শব্দে পা জোড়া প্রসারিত করে আমি মেঝে পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করলাম। এই কসরতে আমার ঘাম ছোটে দর দর করে। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করলাম না আমি। অনেক কষ্টে পা জোড়া মেঝেতে ঠেকালাম। এবং আস্তে আস্তে নীচে নামতে শুরু করলাম। এ সবকিছু আমি নি:শব্দে করছিলাম।কারণ, একটু শব্দ হলেই লোকটা সাবধান হয়ে যাবে।

এবার আমি সম্পূর্নরুপে মেঝের উপরে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর লোকটা --যেই হোক না কেন---ততক্ষণে আমার শিয়রের কাছে চলে এসেছে। ওখানে একরাশ অন্ধকার। লোকটা প্রাণপণে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ রোধ করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু এত কাছে যে, আমি সব আওয়াজ শুনছিলাম।

আমি আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। নি:শব্দে, যেন পদশব্দ শুনতে না পায় লোকটা। এখন আমি লোকটার একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে।

লোকটা খুব দ্রুত বিছানার উপর লাফ মারে। আর সুযোগ বুঝে আমিও লাফিয়ে পড়ি তার ঘাড়ে।

লোকটার কন্ঠ চিরে একটি চাপা চিৎকার বেরোয়। আমি ওকে দু'বাহু দিয়ে চেঁপে ধরি। কিন্তু লোকটার শরীর বেশ মোটা এবং তাগড়া। অনেক কসরত করে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। তারপর উল্টো আমাকে কাবু করার জন্য থ্রি নট থ্রি-টা খোঁজার চেষ্টা করে।

থ্রি নট থ্রি- টা কোথায় আমি জানি। আমি চোখ বন্ধ করে অন্ধকারেই লাথি চালালাম- থ্রি নট থ্রি- টা আমাদের ধস্তাধস্তিতে মেঝের উপর গড়াতে গড়াতে দূরে গিয়ে পড়ে।

এবার আমরা উভয়েই মুখোমুখি। এবং অন্ধকারে একে অপরকে লাথি-ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছি। অনেক কসরত করে সে একবার আমাকে দু'হাতের ফাঁকে চেপে ধরে। এবং মাথা মেঝের সাথে ঠুকতে থাকে।

একবার, দু'বার, তিনবার।

আমার মাথা থেকে শুরু করে সমস্ত শরীওে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। মাথা ঘুরতে শুরু করে। অনেক চেষ্টার পর তার বাহু থেকে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। এবং শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে জোরে তার চোয়াল বরাবর একটা ঘুষি চালিয়ে দিলাম। লোকটা উল্টে গিয়ে দূরে পড়ে গেলে আমার একটা পা ছুটে গেলো তার বাহুবন্ধন থেকে।

তারপর লোকটা তলপেট বরাবর জোরে আরেকটা লাথি মারলে পালঙ্কে উপর গিয়ে পড়ে লোকটা। এবার আমি পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও।

এই শেষ লাথির চোটে পালঙ্কটাও ভেঙ্গে যায়। আমি আরেকটা লাথি মেরে পালঙ্কটা উল্টিয়ে তার গায়ের উপর চেপে ধরি। আর সে অতিকষ্টে পালঙ্কের নিচে থেকে উঠে আসার চেষ্টা করে।

এই ফাঁকে আমি টর্চটা খুঁজে নিলাম- যেটা তেপায়া থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলো। তারপর টর্চ জ্বালিয়ে থ্রি নট থ্রি- টা কুড়িয়ে নিলাম। এবং পালঙ্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুমের ভেতরে ঢুকে গেছে ।

তাড়াতাড়ি টর্চের আলো ফেলে দেখি একটা লোক লাফাতে লাফাতে পাশের কক্ষে চলে যাচ্ছে । কক্ষটার দরজা খোলা ছিল । টর্চটা ওখানে ফেলেই লোকটার পিছু ধাওয়া করলাম আমি। এখন আর আমার আর কিছুতেই ভয় নেই। কারণ থ্রি নট থ্রি এখন আমার হাতে। লোকটা তখন উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছিলো। কারণ থ্রি নট থ্রি ও দেখে ফেলেছে। পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে লোকটা কাঠের বড় করিডর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে অন্য দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর আমি তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকি ।
এবার লোকটা দ্বিতীয় করিডোর দিয়ে ছুটতে থাকে। কাচের জানালা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ার উদ্যোগ নেয়। নীচে গভীর কানাল। কিল্লার চারপাশে নদীটা একটা গভীর কানালের সৃষ্টি করে রেখেছে ।
'দাড়াও—দাড়াও—থামো!'—আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, 'নতুবা গুলী করব ।'
কিন্তু লোকটা থামে না। জোরে একটা লফ মের রঙিন কাঁচের জানালাটা ভেঙে ফেলে। লোকটার ইচ্ছে ছিল জানালাটা ভেঙে নিচে নদীর স্রোতে গিয়ে পড়বে। ঠিক তখুনি আমি গুলি চালালাম। জানালার কাঁচ ভেঙে যায় একটা প্রকান্ড শব্দ করে। ততক্ষনে লোকটার পুরো শরীর বাইরে চলে যায়। কিন্তু লোকটার পরনের মোটা

কাপড় আটকে যায় জানালার একটি ভাঙা অংশের সাথে। লোকটা ঝুলতে থাকে। যে হতে গুলি লেগেছিল সেই হাতে জানালাটা ধরে রেখেছিল সে। নীচে গভির ক্যানাল। আমি দৌড়ে এসে লোকটার দু বাহু ধরে ফেলি। লোকটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে ।

এক সময় ভয়ানকভাবে মেঘ গর্জন করে উঠে। সাথে সাথে বিদ্যুৎও চমকায়। সে চমকে আমি লোকটার চেহারা দেখে চিনে ফেলি।
সে আর কেউ নয়,শংকর।
'আমাকে বাঁচান সাহেব---আমাকে বাঁচান!' শংকর বলে ওঠে।

'শিবন্তীর লাশটা কোথায় পুতে রেখেছ বলো ?' আমি জিজ্ঞেস করি ।

'আপনি যে কক্ষে থাকেন তার নীচে,হল ঘরের পেছনে পুতে রেখেছি'

'কে পুতেছে?'

'আমি। তবে জেফারসন সাহবের নির্দেশেই। সাহেব আমাকে বাচান! আমাকে বাঁচান ! আমাকে উপরে তুলে নিন—সাহেব, আমি সব বলছি ।'

শংকরের বিরাট বপু হায়ায় দুলছিলো। আর ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে ছিলো। এবং কটি বাহু থেকে রক্ত পড়ছিলো চুঁইয়ে চঁুইয়ে। দুটি হত তখনও আমার শক্ত মুঠিতে ছিলো।

'সাহেব, আমার হাত ছাড়বন না' শংকর গোঙাতে গোঙাতে বলে, 'হাত ছাড়বেন না সাহেব—তা না হলে আমি মরে যাবো'---নীচে গভীর ক্যানেলের দিক তাকায় শংকর । তা সমস্ত চেহারা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

'ছাড়বো না—প্রতিজ্ঞা করছি, কিন্তু সত্যি করে বলো শিবন্তীকে কে মেরেছে ?'

'আমি মেরেছি সাহেব—দুটি হাত দিয়ে ওর গলা টিপে মেরেছি।'

'কেন?'

'বড্ড চিৎকার করছিলো তাই। সাহেব যখন ওকে নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং কিছুখন রেখে আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন, তখন দেখি ওর শরীরের সমস্ত কাপড় ছেড়া । সারা শরীর রক্তে একাকার হয়ে আছে। তার উপর আবার ও খুব চেচামেচি করছিলো। আর জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছিলো।'

'রাগে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো ও। তখন জেফারসন সাহেব বললেন,--ওকে এই মুহুর্তে শেষ করে দাও এবং লাশ এই কিল্লার নিচেই পুঁতে ফেলো'

তৎক্ষণাৎ শংকরের দুটি হাত ছেড়ে দিই আমি। হতাশা ভরা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরোয় ওর কণ্ঠ চিরে। সমস্ত আকাশ বাতাস মথিত করতে করতে গভীর ক্যানেলের ভেতরে ডুবে যায় সেই চিৎকার ।
ওর দেহ পানিতে ডোবেনি; শক্ত পাথরের সাথে আঘাত খেতে খতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

পরবর্তী তিন চার দিনের মধ্যে সব কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটলো। গাঁ থেকে একজন লোককে তিরাহ পাঠিয়ে পুলিশ ডেকে আনলাম। পুরো গাঁয়ের লোকজনদের ডকে এনে সবার সামনে পুলিশ দিয়ে কিল্লার মেঝে খোদালাম। মেঝের ভেতর থকটি মেয়ের হাড্ডির ক্রেম বেরলো। যেটাকে যথাযথ মর্যাদার সাথে সেদিনই তীরে সৎকার করা হলো ।

পুলিশ শংকরের লাশও নিজেদের হেফাজত নিয়ে নেয়। সেই সুবাদে গ্রামবাসীসহ আমারো জবাবন্দী লিপিবদ্ধ করে নিয়ে যায়।

গ্রামবাসী আমার কথা কখনও বিশ্বাস করতোনা যদিনা বাজ পড়ে রবি দাসের ঘর জ্বলে যেত। খাটে শুয়েছিলো রবি দাস-বিজলী তর খটের উপর এসেই পড়ে। তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। কিনতু তার সাথেই স্ত্রী এবং ছেলে শুয়ে ছিলো। তাদের কিছুই হয়নি।

কেউ কেউ এটাকে নিছক একটা দুর্ঘটনা বতে পরে। কিন্তু গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষদের জন্যে এটা একটা বিরাট ইঙ্গিত—আমার কথা বিশ্বাস করে ওরা।

সেই রাতে ড়ে উপত্যকার সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। গ্রমের দুজন বিশিষ্ট ব্যাক্তির প্রাণনাশ হয়। এতো তি হওয়া সতেও গ্রামবাসী মনপ্রনে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি লাভ করতে থাকে।

মানুষের প্রতি মানুষের যে একটা অবিশ্বাস্যভাব,যে একটা সন্দেহ---তার নিরসন ঘটে। এখন গোটা গ্রাম এবং তার মনুষগুলোকে কেমন যেন পুতঃ পবত্র মনে হতে থাকে। যেন অনক বছর পর তার প্রায়শ্চত্ত হলো ।

স্বয়ং আমার কাছেও মনে হচছিলো যেন কিল্লাটার রুপ-রঙটাই পাল্টে গেছে। অথচ কি আর এমন পাল্টেছে—যেন কিল্লাটার সমস্ত দরোজা, জানালা, দেয়াল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

গোল কক্ষের ছবিগুলো যেন হাসছে। এবং কিল্লার চারদিকের পানি যেন স্বস্তির সাথে কল কল করে প্রবাহিত হচ্ছে। যে নিষ্পাপ সহজ সরল এবং দুঃখী একটি প্রাণের রক্তের ভারে এই কিল্লার আকাশ বাতাস গোটা পরিবেশ ভারাক্রান্ত ছিল—এখন একটি ঝড়ের শেষে নতূন সূর্যে স্নাত হয়ে কিল্লাটা যেন খুশীতে চক চক করছে।

সবকিছুই ঠিক। যে রকম হবার ছিলো ঠিক তাই হয়েছে। শুধু আমার মনের সুখ এবং শান্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কারণ শেষকৃত্য পালন করার পর শিবন্তী আমার কাছে আসা ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন থেকে ও আর স্বপ্নেও আসে না।

কে জানে ওটা স্বপ্ন কি বাস্তব। তবে সেদিনের পর আর ও আমার কক্ষে কখনো আসেনি। এখন তো ওর আত্মা মুক্ত হয়ে গেছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, আসবে। অন্ততঃ একবারের জন্যে হলেও ও আমার কাছে আসবে।

শেষ সাক্ষাতের প্রতিজ্ঞাটা এখনো আমার মনে আছে। তুমি বলেছিলে, আমি আসবোই। শেষবারের মতো তোমাকে দেখা দিয়ে যাবো।

কিন্তু এখন তোমার পাখা তুমি পেয়ে গেছো—তোমার আত্মা মুক্ত পরিবেশে উড়ে বেড়াচ্ছে। তুমি এই মাটির মানুষের ব্যথা কি বুঝবে? যে কিনা দু'বাহু বাড়িয়ে তোমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রাতের নৈঃশব্দ্যকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে?

শিবন্তী! শিবন্তী—কিন্তু কিল্লা থেকে তো তুমি অদৃশ্য হয়ে গেছো, এবং তোমার সুবাসও—এখন আমার মাথায় কারো কাপুরী আঙ্গুলের প্রেমমাখা স্পর্শ অনুভূত হয় না। কেউ আর আমার চেহারার উপর ঝুঁকে পড়ে উদাস মাখা স্বরে আদর জানায় না। সেই গভীর চোখ কোথায় পাই—যার ভেতরে ডুবে যেতে মন চায়।

তা তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে কেন? এই পৃথিবীর মানুষগুলো তো মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে। মেয়েরা কি জীবনের ওপারে গিয়েও তাদের প্রেমিকদের জ্বালিয়ে মারে?

দিন অতিবাহিত হবার সাথে সাথে আমার অস্থিরতাও বাড়তে থাকে। যদি সে শিবন্তীর আত্মা না হয়ে আমার মন-মানসের গড়া কোন মেয়ে হতো তাহলে এখন আমার এতো আকুতি মিনতির পরও আমাকে দেখা না দিয়ে কিভাবে থাকতে পারতো?

রাতের নিঃসঙ্গতায় আমি ওকে নিজের কাছে ডাকি। প্রবল আকাঙ্খার সাথে আমি ওকে ডাকি। কিন্তু যতই ডাকি ও যেন ততই দূরে দূরে সরে যায়। আমার বদ্ধ কামরার অন্ধকার আরো গভীর কালো হয়ে দেখা দেয়। সেই অন্ধকারের গভীরতায় না দেখা দেয় শিবন্তীর গভীর কালো একজোড়া চোখ, না সাদা শাড়ীর আঁচল, না সেই একজোড়া গোলাপী পদ্মচরণ—সবকিছুই অদৃশ্য। আজীবনের জন্যে বিদায় নিয়ে গেছে। কিল্লার ভূত আজীবনের জন্যে চলে গেছে।

তাহলে ও প্রতিজ্ঞা কেন করেছিলো?

আরে পাগল ওটা ওর প্রতিজ্ঞা নয়, তোর প্রতিজ্ঞা। নিজের সাথে, নিজের ভাবনা-চিন্তার সাথে তোর নিজেরই প্রতিজ্ঞা ওটা। অথবা ওকে আসতে দিচ্ছে না কেউ। যেখানে ও আছে সেখান থেকে আসতে দিচ্ছে না। এখন ও পরিপূর্ণভাবে মুক্ত। এই পৃথিবীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছে। ও এই সংসারের ঝামেলার মধ্যে আসতে চাইবে কেন?

কিন্তু ও এভাবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে এ যেন মন কিছুতেই মানতে চায় না। এজন্যে প্রতিটি রাতের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা যেন বাড়তেই থাকে। কিন্তু আটদিন, দশদিন, পনেরদিন অতিবাহিত হবার পরও যখন ও আসে না—তখন মনটা একরাশ হতাশায় ভরে যায়। কেমন যেন দুর্বল হয়ে যাই আমি। প্রতিটি মানুষের ভেতরে একটি গোপন মিটার লাগানো থাকে। সে মিটার আমাকে জানিয়ে দেয়, তোর প্রতীক্ষা করা এখন বৃথা। শিবন্তী এই কিল্লা ছেড়ে আজীবনের জন্যে চলে গেছে। ও আর আসবে না।

উপত্যকা ছেড়ে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই আমি। এখানকার কাজ শেষ হওয়া দূরে থাক, ভালো করে শুরুই করতে পারিনি এখনো। কিন্তু এখন আর এই উপত্যকায় কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক মুহূর্তও আর এখানে থাকতে পারি না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উপত্যকা ছেড়ে আমাকে চলে যেতেই হবে। নতুবা এই অপয়া উপত্যকা আমাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ছাড়বে।

ফিরে যাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলি আমি। কুলী, ঘোড়া, রাস্তা দেখানোর লোকজন—সব ঠিক করে নিলাম। পরদিন ভোর চারটায় সবাইকে ডেকে মাল-সামান বেঁধে-সেধে ওদের বিদায় দিলাম। আমি দু'ঘন্টা পর রওনা দেব।

দু'ঘন্টার মধ্যে পুরো কিল্লাটা শেষবারের মতো দেখে নিই আমি। সব জায়গা, যেখানে যেখানে শিবন্তী হেঁটে বেড়িয়েছে, যেখানে রাত কাটিয়েছি—সব জায়গা সেশবারের মতো দেখে নিই।

কিন্তু শিবন্তীর কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না।

অতঃপর কিল্লা ছেড়ে গাঁ ছেড়ে আমি হাঁটতে থাকি। জঙ্গলী রাস্তা ধরে, বাঁকাচোরা পথ ধরে এগিয়ে যাই। আবার চারদিকের ঘন জঙ্গল আমাকে ঘিরে ধরে। আবার উঁচু পাহাড়ের উপর দৃষ্টি ঝাপসা হতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর আমার কানে গুঞ্জন তোলে...

'রাতে গঙ্গা বহে না!'

আমি চমকে উঠে দেখি অস্পষ্ট সাদা কুয়াশাচ্ছন্নতার ভেতরে একজোড়া গোলাপী পদ্মচরণ, সাদা শাড়ী এবং আঁচলের ফাঁকে সেই পাতলা কমনীয় চেহারা।

‘শিবন্তী!’ আমি খুশীতে চিৎকার দিয়ে উঠি।

ও আমার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এবং আস্তে করে উদাসমাখা স্বরে বলে, ‘না, আমি রত্না।’

‘রত্না! তুমি কথা বলতে পারছো?’ আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি।

‘হ্যাঁ—’ ও বলে, ‘আমি নিজের মনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। যতদিন শিবন্তীর মৃত্যুরহস্য উন্মোচিত না হবে, ততদিন আমি কথা বলবো না। পৃথিবীর মানুষের কাছে বোবা হয়ে থাকবো। শেষ পর্যন্ত বাবু তোমার দয়ায় শিবন্তীর মৃত্যুরহস্য উন্মোচিত হয়েছে। ওকে যারা খুন করেছে--তাদের শাস্তি হয়ে গেছে। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।’

নিজের কম্পিত হাতজোড়া দিয়ে আমার দুটি হাত ধরে ফেলে রত্না। আমি ওর হাতে নিজের হাতজোড়া থাকতে দিই কিছুক্ষণ। পরে আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে বলি, ‘ঠিক আছে রত্না—ঠিক আছে। এখন আমি যাই।’

বলেই আমি মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করি। আচ্ছা, ওকে আমি কি আর বলতে পারি!

অনেকক্ষণ ধরে ও আমার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে পিছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরে। এবং বলে, ‘যাচ্ছো কোথায়?’

‘নিজের দেশে.....কেন?’

‘না,’ মাথা নেড়ে বলে রত্না, ‘ফিরে চলো।’

‘কেন?’

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলে রত্না, ‘আমার গর্ভে তোমার সন্তান।’

‘কি বলছো তুমি!’—রাগে চিৎকার দিয়ে উঠি আমি, ‘এসব কি ধোঁকাবাজী?’

‘ধোঁকাবাজী নয় বাবু,’—আমার চোখে চোখ রেখে বলে রত্না, ‘আমি রত্না.....রত্নাই শিবন্তীর বেশে রাতে তোমার কাছে যেতাম। সে শিবন্তী নয়, আমিই। তোমাকে গলা জড়িয়ে ধরতাম, তোমার বাহু-বন্ধনে বার বার ধরা দিতাম, রাতে জেগে জেগে তোমার দেখাশুনা করতাম, এবং একরাত তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সে আমিই। আমার রোমে রোমে তোমার দেহের সৌরভ ছড়িয়ে আছে।’

আমি নির্বাক ।

'লালী!'-- ও ফুঁপিয়ে উঠে ।

'এ তুমি কেন করলে রত্না ?' আমার কণ্ঠস্বর যেন ফিসফিসিরে উঠে ।

'আমার বোনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে । আমি স্বচক্ষে দেখেছি গোকুল দাস শিবন্তীকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে । আমি তাকে চিনতাম ।তাকে ধরতেও পারতাম । কিন্তু আমার বাবা যখন আত্নহত্যা করে বসে,তখন গাঁয়ে কেবল

আমি সম্পূর্নরুপে একা,নিঃসঙ্গ,সহায়-সম্বলীন হয়ে পড়ি । আর আমার বোনের সন্মান এবং সতীত্বহানীর জন্য যে দায়ী--সে আমারই বাবার আপন ভাই,গাঁয়ের নম্বরদার । এজন্যে মার ঠোট জোড়া আমি

নিজেই সেলাই করে ফেলি । এবং অর্ধ উন্মাদ হয়ে থাকি। তানা হলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলতো ।

আমি বোবা হয়েই বেঁচে রইাম ।এভাবে বছর গড়িয়ে যায়--আর আমি প্রতিক্ষা করতে থাকি সেই লোকের পথ চেয়ে--যে

এই জনমানবহীন বিরান গ্রামে এসে আমার বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে । নতুবা রত্না আজীবন অবিবাহিতা--কুমারীই থেকে যাবে এবং কথা বলতে না পারার

বেদনা নিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে ।'

'কিন্তু তুমি রত্না না হয়ে শিবন্তী হয়ে কেন এলে ?'

'এই জন্যে যে, এই কিল্লায় শিবন্তীর আত্না থাকে । যেখানে তাকে খুন করা হয়েছে এবং পুতে ফেলা হয়েছে--সে জায়গা ছেড়ে ও কি করে যায় ?

ও স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এস শংকরকে ভয় দেখায় ।যারা এই কিল্লায় এসে থাকে তাদেরও স্বপ্নে এসে দেখা দেয় শিবন্তী ।

এই জন্যেই তুমি যেিন প্রথম এই মন্দিরে এলে আমাকে দখে শংকরকে বললে,'রাতে আমি যা কে স্বপ্নে দেখেছি এতো সেই'--সেদিনই আমি

সিদ্ধান্ত নেই ,এবার আমি নিজেই শিবন্তীর আত্নার রুপ ধারন কে তোমার কাছে যাবো ।'

'কেন ?'

মুহুর্ত কয়েক চুপ থাকে ও ।ওর চোখজোড়া --যা এতখন আমাকেই দেখছিল--নিচের দিকে ঝুকে যায় ।

আস্তে করে একটা দীর্ঘশশ্বাস লুকোতে লুকোতে বলে ও,'আমি ভাবলাম তুমি শিবন্তীকে ভালোবেসে ফেলতে পারো--তাহলে তার হত্যার প্রতিশোধ

নিশ্চয় নেবে তুমি'

'বেশ চালাক মেয়ে তো তুমি'--হাসতে বললাম আমি,

'ঠিক ধরেছ । আচ্ছা বলতো কিল্লায় আসতে কোন পথ দিয়ে ? আমি তো নিজ হাতে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিতাম'

রত্নার চখজোড়ায় গর্বিত ভাব ফুটে উঠে,'কিল্লার ভেতর্ মাটির নিচে একটা চোরা কুঠুরী আছে । যেখানে এখন বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা ফেলা হয় ।

সেই কুঠুরি থেকে একটি গুপ্ত পথ মাটির নিচ দিয়ে সোজা মন্দিরে চলে গেছে । সে আমলে রানীরা এ পথ দিয়ে মন্দিরে আসা যাওয়া করতো । এখন আর সেই গপ্ত পথের খবর কারও জানা নেই ।

স্রেফ মন্দিরে পুজারী জানতো সে পথের কথা ।আমার বাবা মৃত্যুর আগে আমাকে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে যায় । '

'আর সেই সুবাস ?'

রত্না শাড়ীর আচলের গিট খোলে এক রকমের বিষাক্ত গাছর মুল বের করে ।

তারপর সেই মুলগুলকে দু হাতে বেশ করে রগর আমার নাকের কাছে নিয়ে এলো । আমি ভয়ে দু কদম পিছিয়ে যাই ।

সেই তীব্র কর্পুরী সুবাস আমার নাকে এসে লাগে ।

আামার মাথা ঘুরতে থাকে ।

'এগুলো ভাল করে শুকলে মানুষ অনেকটা অজ্ঞান হয়ে যায় । না পারে নড়তে চড়তে না পারে হাত নাড়াতে । চোখেও দেখে কম,

কানেও শুনে কম । আর কথা বলতে পারে আস্তে আস্তে ।'

রত্নাও খিলখিল করে হাসতে থাকে ,'তবে আামার কাছে এর প্রতিশেধকও আছে ।যা মুখে পুরে দিলেই এই সুভাস কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা । '

'তুমি সম্ভবত প্রতিষেধকটা মুখে দিয়ে আসো আর আমাকে বিষাক্ত গাছের গুড়োগুলো শুঁকতে দাও ?'

রত্না আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দেয় ।

সাদা শাড়ীর আঁচলের ফাঁকে সেই বিষ্ন চেহাড়ায় একরাশ ব্যাকলতা যেন ছটফট করে ।ঠোট জোড়া কিসের

এক অজানা ব্যাথায় কাঁপতে থাকে ।আর চোখ জোড়য় টলমলে অশ্রু ।তখন আমার কাছে মনে হয়

ও রত্না নয়, শিবন্তী ।

'শিবন্তী---' আমি বলি,'আমি তোমাকে শিবন্তি বলেই ডাকি?'

ও বলে,'রত্না তো তার বোনে হত্যাকারীর মৃত্যুর দিনটি দেখার জন্যেই বেঁচেছিল । এখন আমি--তোমার দু বাহুর বন্ধনে ধরা দেয়ার পর আমি আর রত্না নই,শিবন্তী ।তোমার শিবন্তী-স্রেফ তোমার ।'

দু বাহু দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে এবং নিজের ফুলের মতো দুটি ঠোট দিয়ে আমার ঠোট চেপে ধরে ।তবে এই এই স্বপ্নের সেই ঠোট নয় ।এবং তার ঠোটে চুমু খেতে খেতে শিবন্তীকে দু হাত দিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরতে

আমার কাছে মনে হল যেন,এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছি আমি ।

এই শিবন্তী নকল নয়,আসল শিবন্তী ।সুন্দর মনোমুগ্ধ কারিনী কোমল লাজুক শিবন্তী ।

কাহিনী শেষ করে মোতীলাল নাগর চুপ মেরে যায় ।

ওরা তিনজন নাসিমার কটেজে যাবার পথে রাস্তার একপাশে বসেছিল ।এখান থেকে নাসিমার কটেজ পুরোটা দেখা না গেলেও আংশিক দেখা যায় ।

ডান দিকের অংশ বাগান ঘেরা ।

মোতিলালের পাশে শিবন্তীও বসেছিল । আজ বসন্তের প্রথম দিন ।শিবন্তীর পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ী । কোলে একটা বাচ্চা ।

আকরাম হেসে বলে, 'তারপর নাসিমা ?'

'দিনে দিনে ওর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় ।' --মোতীলাল নাগর বলে,'কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেনা ,কথাবার্তাও বলেনা । আমাদের দুজনের প্রতি তো ওর সাংঘাতিক ঈর্ষা । একসাথে দেখলেই গালিগালাজ করে । এ কারণে ওর ওখানে আমরা কেউ যাই না । '

'কি বলে ও ?'

আকরামের চেহারা লাল হয়ে যায় ঠোঁট জোড়া কাঁপতে থাকে ।

'বলে,যাকে জীবনের দশটি বছর দিয়েছি ,বাকী জীবনটাও ওর জন্য বিলিয়ে দেব ।এই উপত্যকাতেআ আমার মাজার হবে ।'

'দেখা যাবে ।' হঠাৎ উঠে দাড়ায় আকরাম ।

'আমার মনে হয় ওখানে যাওয়াটা এখন তোমার জন্যে বৃথা'

আমার দিকে তাকায় আকরাম ।তারপর ফ্যাঁকাশে এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলে,'কিন্তু আমি যাবই ।'

সামনের দিকে এগিয়ে যায় ও ।

আমারও ওর পেছনে পেছনে সামান্য দুরুত্ব রেখে চলতে থাকি ।গেটের কাছে এসে আমি ওকে বলি,'ওই দেখো পোর্টি-কোতে বসে আছে আরাম কেদারায়--ব্যাস এবার তুমি যাও-আমাদের পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয় ।'

কটেজের পুরনো কাঠের গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকে কংক্রীটের পথ ধরে এগিয়ে যায় আকরাম ।

পায়ের আওয়াজ শুনে নাসিমা চমকে উঠে ওর দিকে তাকায় ।

অনেকক্ষন ধরে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে আকরামকে ওর দিকে আসতে দেখে তাকিয়ে থাকে ও ।

পরে হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে যায় এবং দুটি হাত প্রসারিত করে আকরামের দিকে ছুটে যায় ।

'আকরাম--আকরাম--'

পথের মাঝখানে ওরা পরস্পর পরস্পরের বুকে ঝাপিয়ে পড়ে ।

আকরাম ওকে বুকে টেনে নেয় ।আর নাসিমা উন্মাদের মত তার বুকের ভেতর লেপ্টে যেতে থাকে ।

আমি শিবন্তীর কোমর জড়িয়ে ধরে বলি,'চলো, ঘরে চল...একটু পরেই নাসিমা দৌড়ে এসে বলবে,'ভাইয়া, ভাইয়া, তাড়াতাড়ি আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো ।''

সমাপ্ত

বিশেষ অনুরোধ

দয়া করে বইটি অন্য কোথাও শেয়ার করলে http://ebooks.alor-nishan.com এবং "বই লাভার'স পোলাপাইন" গ্রুপের নাম উল্লেখ্য করবেন ।